সবপেয়েছির আসরের দ্বি-বার্ষিক মুখপত্র

সংগঠনী

২০২১-২০২২

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা ❑ প্রদীপ রায়

সভাপতি ❑ শ্যামল কুমার বসু

সম্পাদক ❑ তারক মজুমদার

সহযোগী ❑ বিশ্বজিৎ খাস্তগীর, জয়দেব বারুই, প্রভাস রায়, হরেকৃষ্ণ দে, গৌতমকুমার নন্দী, গোপাল ভৌমিক, সনাতন সেন, মানস রায় ও মাধব রায়

প্রচ্ছদ ❑ *********

ছবি ❑ আসরের কর্মীবৃন্দ

মুদ্রণে ❑ মুদ্রণ

বর্ণসংস্থাপন ❑ অর্পিতা দে

প্রকাশক ❑ দিলীপ চক্রবর্ত্তী, মূলসত্যসেবী

সবপেয়েছির আসর

মূলকেন্দ্র ❑ ৪ জেমস্ লঙ সরণী, বড়িষা

কলকাতা ৭০০ ০০৮

আমাদের কথা

সবপেয়েছির আসর সর্বভারতীয় শিশু ও কিশোর কল্যাণ প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৫ সাল থেকে দীর্ঘ আটাত্তর বছর ধরে শিশু ও কিশোরদের সুনাগরিক গড়ে তোলার এক মহান ব্রতে উদ্বুদ্ধ। ২০১৮-২০২০ সালের পর সংগঠনের দ্বি-বার্ষিক মুখপত্র "সংগঠনী" প্রকাশ করা যায়নি করোনা অতিমারীর কারণে। ২০২১-২০২৩ বর্ষে সংগঠনী প্রকাশ করছি। সংগঠনীর মাধ্যমে সংগঠনের বিস্তৃত কর্মসূচী সকলের সামনে লিখিতভাবে তুলে ধরা প্রয়াস থাকে। এই প্রকাশনায় যেমন সাম্প্রতিক ঘটনা আছে তেমন অতীতের অনেক কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। সংগঠনীতে মৌলিক লেখার পাশাপাশি আসরের খেলাধূলা, ছড়ার ব্যায়াম, ভঙ্গীগীতি, আসরের বিগত বছরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সংবাদ, সংগঠনের নিয়মশৃঙ্খলা ও অন্যান্য সাংগঠনিক তথ্য এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। লেখার বিষয় নির্বাচনেও আসরের আদর্শ, লক্ষ্য ও তাৎপর্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশাকরি শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্য গঠনে রকমারি লেখা সম্বলিত এই দ্বি-বার্ষিক "সংগঠনী" সকলের কাছে আদরণীয় হবে, অনুপ্রেরণা দেবে এবং শাখা আসরদের কাজে সহায়তা প্রদান করবে।

শুভম্

সবপেয়েছির আসর

দিলীপ চক্রবর্ত্তী

*সাধারণ সম্পাদক, **মূল সত্যসেবী***

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 1

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

- আমাদের কথা □ মূলসত্যসেবী ০
- সম্পাদনা পরিষদ □ মূলকেন্দ্র
- সূচিপত্র □ মূলকেন্দ্র ১
- পরিচালন সমিতি □ মূলকেন্দ্র

গানের আসর

- আসরের গান □ পরিমল দাস ৫৪
- আমার প্রাণের আসর □ গণেশ মুখার্জী ৫৫

ছড়ার কথা

- ছড়ার নন্দনে □ বিকাশ প্রামাণিক ৩

সংগঠন

- নেতৃত্ব ও সংগঠন □ সনৎ ভট্টাচার্য্য ৩৬
- কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন ও প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ □ মূলকেন্দ্র ৬
- Sab Payechir Asar □ মূলকেন্দ্র ২৩
- শোনো সবাই শোনো □ অধ্যাপক বুদ্ধদেব চক্রবর্ত্তী ৩৮

শুভেচ্ছা

- স্বপনবুড়োর শুভেচ্ছা □ মূলকেন্দ্র ৩৭

এগিয়ে চলার ***

- একটু পা চালিয়ে ভাই □ সোমেশ ভূঁইঞা ৪২
- ফিরে দেখা ইতিহাস : স্বাধীন ভারতে জনজাগরণ এবং সবপেয়েছির আসরের নববর্ষ উৎসবের সূচনা □ অনির্বাণ ঘোষ ৪৮

নক্ষত্র পতন

- চাই ঐক্যবদ্ধ গতিময় সবপেয়েছির আসর □ প্রদীপ রায় ৪৫

খেলা

- আসরই খো খো-কে জনপ্রিয় করেছে □ বলরাম হালদার ৪৬

পরিবেশ বিজ্ঞান

- বাঁচার জন্য বাঁচানো □ রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায় ৫
- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস— একটি পর্যালোচনা □ ডাঃ নয়ন মুখার্জ্জী ৩৪
- জলই জীবন — জলই মরণের কারণ □ ডঃ সুমিত্রা খাঁ ৩৫

গল্প ভ্রমণ | মনন

- মণিমহেশ যাত্রা □ অসীম দাস ৮
- সত্যি ভুতের গল্প □ গোপাল আইচ ১৬
- অস্তিত্ব সংকট □ অনিন্দ্য মুখার্জী ৭
- অমৃতলোকের সন্ধানে □ শ্রীমাষ্টারমশাই ৩৮

ইতিহাস | দেশপ্রেম

- ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর □ ডঃ ভাস্কর কুমার কয়াড়ী ১৩
- দেশপ্রেমিক, সমগীত প্রেমিক এবং প্রকৃতি প্রেমিক সুভাষ চন্দ্র □ স্বপন কুমার রায় ১৪
- জাতীয় পতাকা □ সনৎ ভট্টাচার্য্য ১৯
- আশিস যাদের সহায় মোদের □ অজিত বসু ২০
- নেতাজী কন্যা অনিতা বসু ও সবপেয়েছির আসর □ গনেশ ঘোষ ৪২

নিজেদের কথা

- শিশুমন ও আধুনিক সমাজ □ সংগীতা ভট্টাচার্য্য ৪৩
- অতিক্রম ৫০ বছর, 'ইলছোবা সবপেয়েছির আসর □ নারায়ণ শঙ্কর দাস ২
- সবপেয়েছির আসর ও শিশু-কিশোর □ সুমিত্রা গায়েন ১০
- মুখোশ তৈরি করা শিখে নাও □ সুনীল আদক ৪৪
- বারো মাসে তেরো পার্বণ □ মূলকেন্দ্র ৫২

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 2

সবপেয়েছির আসর

স্থাপিত - ১৯৪৫

(সর্বভারতীয় শিশু-কিশোর কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান)

বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংস্থার অনুমোদিত

(১৮৬০ সালের ২১ নং আইনে রেজিস্ট্রিকৃত)

মূলকেন্দ্র ঃ **কেন্দ্রীয় শিশু ভবন**, ৪, জেমস্ লঙ্ সরণী, বড়িষা, কলকাতা-৭০০ ০০৮

e-mail : asarsabpayechir@gmail.com

মূলকেন্দ্র পরিচালন কমিটি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
মাননীয় রাজ্যপাল
পশ্চিমবঙ্গ

প্রধান উপদেষ্টা
অজিত বন্দোপাধ্যায়
সভাপতি, আই. এফ. এ., কার্যকারী সমিতির সদস্য আই.ও.এ.

সভাপতি
কমলেশ চট্টোপাধ্যায়
৯৪৩৩১৬৭২৭৩

সাধারণ সম্পাদক :
দিলীপ চক্রবর্তী
(৯৩৩৯১৪৫২৬৩)

সহ: সম্পাদক :
জয়দেব বারুই
(৯৪৩৩৮৯৯০০৪)

কার্যনির্বাহী সভাপতি :
অপূর্ব গাঙ্গুলী
৯২৩২৯৪০৭৯৩

কোষাধ্যক্ষ :
অপরেশ মজুমদার
(৮৭৭৭৭০৯৯২৩)

সহ: সভাপতি :

তরুণ কান্তি চৌধুরী
৯৪৩৩৮৩৬৬৯০

প্রদীপ রায়
৯০৫১৪৬৪৮৭৫

বিষ্ণু জীবন চক্রবর্তী
৭৪৩৯৩২০৫৪৪

বিভাগীয় সচিব -

সংগঠন :
তিমির বরণ সরস্বতী
(৯৭৩২৫৫৭২৭০)

শিক্ষণ :
তরুন চক্রবর্তী
(৭০০৩৯০৯০৮০)

দপ্তর :
প্রভাস রায়
(৮২৪০২১৮৪৬৬)

সাংস্কৃতিক :
স্বপন কুমার রায়
(৯১৬৩০৮৪৯০৫)

শিবির :
প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়
(৯০৬৪১৯৭৬৩২)

ক্রীড়া :
বলরাম হালদার
(৯৮৩১৪৭৭১৭১)

সেবা :
হরেকৃষ্ণ দে
(৯১২৩৬২০৫১৩)

প্রকাশনা :
তারক মজুমদার
(৭০০৩৫৭৭৭৬৩)

প্রচার :
গোপাল ভৌমিক
(৭৬৮৬০৩২৬৮৮)

পরীক্ষা :
বিকাশ প্রামাণিক
(৯৪৩৪৮২১৫২১)

সম্পত্তি সংরক্ষণ :
গৌতম কুমার নন্দী
(৯৮৩০১৯৩৫০৬)

শিশুভবন :
নিখিল রায়
(৯০৫১২৭১৭৪৪)

আভ্যন্তরীন হিসাব পরীক্ষক :
রবীন্দ্র নাথ রায়
(৮২৫০৯১১৮৮৩)

হিসাবরক্ষক :
সুমিত সাহা
(৯৮৩৬৮২৯৯০৭)

সদস্য :

প্রণব রঞ্জন বসু **রতন ঘোষ** **প্রদীপ দাস** **জুবিলী ঘোষ** **সব্যসাচী চৌধুরী**

বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য :
কল্যাণ মল্লিক
অবসরপ্রাপ্ত আ.ই.পি.এস

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 3

অতিক্রম ৫০ বছর, 'ইলছোবা সবপেয়েছির আসর'

নারায়ণ শঙ্কর দাস

(উপদেষ্টা, হুগলী জেলা স.পে.আ.)

হুগলী জেলার পান্ডুয়া থানার অন্যতম প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম 'ইলছোবা'-র চিরস্মরণীয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ও সাহিত্যিক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন (বন্দ্যোপাধ্যায়) এর নামের স্মৃতিতে গড়ে উঠেছিল সবপেয়েছির আসরের একটি শাখা (১৯৫৯-৬১), মূল কাণ্ডারী প্রশান্ত ঘোষের প্রচেষ্টায়। ক্ষণস্থায়ী সেই আসরের ১০-১২ বছরের এক সোনারকাঠি (কেন্দ্রীয় সভ্যপত্র সংখ্যা ১৭৪৫০৯; ১৯৫৯) হিসেবে তার কিশোরমনে ঘুমিয়ে থাকা বন্ধ হয়ে যাওয়া সেই 'আসর'কে পুনরুজ্জীবিত করার অদম্য বাসনা পূরণে সক্ষম হয়েছিল তার ২১ বছর বয়সে, ১৯৭০-এ। শ্রদ্ধেয় স্বপনবুড়োর পরামর্শে, মূলকেন্দ্রের সাথে দপ্তরীয় যোগাযোগ সাপেক্ষে (সংগত কারণেই আগের পরিচিতিতে না হয়ে) 'ইলছোবা' নামের শাখা আসরটি প্রতিষ্ঠিত হল নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণ চন্দ্র মিত্র (প্রয়াত)-র যৌথ প্রস্তাবক্রমে। প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের কাজে এলেন, হুগলী জেলার সংগঠক গোপাল আইচ, মূলকেন্দ্রের সৌরেন রায়চৌধুরী (প্রয়াত) ও নিখিল রায়। স্থায়ী অনুমোদন লাভের পর জেলা সংগঠকের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে শ্রীরামপুর 'গুচ্ছিকা' আসরের অশোক চ্যাটার্জী ও অনীশ দাস-এর সক্রিয় সহযোগিতায় সারাদিনের শিবির উদ্‌যাপনের মাধ্যমে এই আসরের সূচনা পর্বের সগর্ব বার্তা প্রচারিত হল স্থানীয় এলাকায়। গুচ্ছিকা আসরের দুই কর্মী বরুণ ও নির্মল পালাক্রমে এসে স.পে.আ.'র নানা বিষয়ের ব্যবহারিক শিক্ষণ দিয়ে যেতে থাকলেন। স্থানীয় এলাকা থেকে আসরের পরিচালন সমিতি ও উপদেষ্টা পরিষদে অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল পর্যায়ক্রমে, মাননীয় এস.আই.অফ স্কুলস; স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক মহাশয়সহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সমাজ- সেবীগণের। তাদের আন্তরিক বদান্যতায়, প্রতিষ্ঠাতা-সংঘমিত্র হিসেবে এই 'আসর'কে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্লক, জেলা, রাজ্য তথা কেন্দ্রীয়স্তরে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ১৯৭২-এ দুর্গাপুরের প্রথমটি সহ চারটি কেন্দ্রীয় কর্মী প্রশিক্ষণ শিবিরে, প্রায় ছয়-সাতটি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক বার্ষিক শিক্ষা শিবিরে, দুইটি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক কর্মশালায় এবং বেশ কয়েকটি আসর-ভিত্তিক শিক্ষা-শিবিরে নিজের ও অন্য কর্মী-সোনারকাঠি সহ যোগদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষণ এই আসরের এগিয়ে যাওয়ার সহায়ক হয়েছে। অ্যাথলেটিকস্, ফুটবল, খোখো, কাবাডি খেলাগুলির প্রশিক্ষক, সর্বভারতীয় লোকনৃত্য ও ব্রতচারী প্রশিক্ষণে এবং অফিসিয়াল পরীক্ষার নিজের যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে সোনারকাঠিদের ঐ বিষয়গুলিতে পারদর্শী করে তোলা সম্ভব হয়েছে। দুইবার হুগলি জেলা খো খো প্রতিযোগিতা, সাতদিনের অনাবাসিক শিক্ষণ শিবির, ফুটবল, এ্যাথলেটিকস্ ও খোখো খেলা, হুগলী জেলার স.পে.আ-র ৩২তম বার্ষিক শিক্ষাশিবির (২৭-৩০ জানুয়ারি, ২০২২) এবং কেন্দ্রীয় ২৩তম যুবকর্মী প্রশিক্ষণ শিবির (৫ - ৮ জুন, ২০১৩) গুলির ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে এই আসরের মাধ্যমে। বিভিন্ন কর্মসূচিতে আগত পরিদর্শক বা অতিথিবৃন্দের মধ্যে উল্লেখ্য মাননীয় হুগলি জেলা শাসক, জেলা পুলিশসুপার, জেলা ও ব্লক সমাজ শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক, জেলা শারীরশিক্ষা ও যুবকল্যাণ আধিকারিক, জেলা ও ব্লক যুবআধিকারিক, বিধায়ক (পাণ্ডুয়া), বিডিও প্রমুখ। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও জেলা সংগঠনের সহায়তায় 'সঞ্চারী' আসর প্রতিষ্ঠা করা গিয়েছে। কর্মী সোনারকাঠিদের অনেকেই 'আসর প্রবেশিকা' পরীক্ষায় এবং ২০১৪ পর্যন্ত ২৩ জন সোনারকাঠি 'সত্যসেবী' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ১৯৮০-৯০ এই দশকটি ছিল সার্বিক ভাবে এই আসরের স্বর্ণময় দিন। বিগত বেশ কয়েক বছর যাবৎ, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবামূলক এবং সরকারি বিভিন্ন জনসংযোগ কর্মসূচিতে সাংগঠনিক ও প্রতিযোগিতামূলক বিষয়ে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছে। স.পে.আ.-র কেন্দ্রীয় ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সূচনাপর্বে, এই আসর অন্যতম সহযোগী হিসেবে পোলবা থানার 'রত্নদীপ' আসর আয়োজিত অনুষ্ঠানে (২৯.৭.২০১৯) অংশগ্রহণের পর সম্মিলিতভাবে কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছিল মূলসত্যসেবীর প্রশংসনীয় পরামর্শে। ২০১৯-২০ সালটি ছিল এই আসরের '৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস' উদ্‌যাপিত হয়, ২০ ডিসেম্বর, ২০২০ অনাড়ম্বর কর্মসূচির মাধ্যমে, অনেক প্রাক্তনীদের মধ্যে আসরের প্রথম সোনারকাঠি মৃন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সহ কিছু অভিভাবক ও আসরকর্মী এবং হিতৈষীগণের উপস্থিতিতে সাম্প্রতিক অতিমারী জনিত বিধিনিষেধ ও সচেতনতা বজায় রেখেই কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক বিভিন্ন কর্মসূচিতে আসর অংশগ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় প্লাটিনাম জয়ন্তীতে শরিক হওয়া ও আনুষঙ্গিক কর্তব্য পালনের জন্য উদ্‌যাপন সমিতি কর্তৃক এই আসর বিশেষ প্রশস্তিকা অর্জনে সক্ষম হয়েছে হুগলী অঞ্চলের একমাত্র শাখা হিসেবে। ২০২১ থেকে সম্পূর্ণ নতুন সোনারকাঠিদের সমাবেশে আসর মাঠ চালু হয়েছে। এসবের মাঝেও আক্ষেপ থেকে যায় ৫০ বছর উত্তীর্ণ এই আসরের নিজস্ব স্থায়ী মাঠ না হওয়ায়; বড় হয়ে ওঠা সোনারকাঠিদের কর্মী হিসেবে কাজ করার নিস্পৃহায়। ফলে, প্রতিষ্ঠার সময়ের মতোই, ২০২১এও বাহাত্তর বছর পার হওয়া সেই আমাকেই আসরমাঠ সামলানোর যাবতীয় দায়ভার বহন করে যেতে হচ্ছে। এই নেতিবাচক দিকটি আসরের ভবিষ্যতের চরম বেদনাদায়ক বার্তার প্রকাশ ঘটাচ্ছে বলা যায়। তবুও আশা রাখি, সকলের সচেতন সহযোগিতায় এই আসর স.পে.আ-র প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার আলোকছটার এক দৃষ্টান্তমূলক ও উজ্জ্বল সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। সেটাই স.পে.আ.-র অন্যতম আদর্শ ও লক্ষ্য।

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 4

ছড়ার নন্দনে

বিকাশ প্রামানিক (পরীক্ষা সচিব, স.পে.আ.)

লোকায়ত জীবনের এক সমৃদ্ধশালী মাধ্যম হল ছড়া। ছড়ার মধ্যে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক লঘুভার হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে বহু ছড়া রচিত হয়ে বাংলার জনজীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলার ঘরে ঘরে এই ছড়ার জন্ম। স্বপ্নময় জাদুময়তার মাধ্যমে রূপকথার জগতে নিয়ে যায় ছড়া। ছড়া সম্ভবতঃ লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম বিষয়। মানুষের স্বকীয়তাবোধ যখন অনুভব এবং অভ্যাসে এসেছে তখন থেকেই ছড়ার জন্ম। ছড়ার ছত্রে ছত্রে মায়ের স্নেহকোমল মনের স্পর্শানুভূতির সংবেদন ছড়িয়ে থাকে। ছেলেমেয়েদের জীবনের সাহিত্যও ছড়া। এর মাধ্যমে নিজেরা সঞ্জীবিত হয় এবং শারীরিক ও মানসিক রসঘন অভিব্যক্তি ঘটে। অনেকাংশে ছড়া সমাজ জীবনের দুঃখ, বেদনা, হাসি, কান্না, সুখ-শান্তি, স্নেহ-মমতা ইত্যাদির প্রকাশও ঘটিয়ে থাকে। অধিকাংশ ছড়ারই মূল উদ্দেশ্য শিশুর মনোরঞ্জন। কিছু ছড়া আছে যা মূলতঃ খেলার সঙ্গে যুক্ত। শৈশব কৈশোরের অহেতুক আনন্দ অপার বিস্ময়বোধ, অস্ফুট প্রকাশ সামর্থ্য এবং অসংলগ্ন উদ্দাম ও স্বাধীন সৃজনশীলতায় এগুলি জীবন্ত ও বর্ণময়।

শিশুর শিক্ষা প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত। এই প্রকৃতি দ্বিবিধ, প্রথমত : শিশুর অভ্যন্তরীণ মানস প্রকৃতি, দ্বিতীয়ত : বহির্জগতের নৈসর্গিক প্রকৃতি। মানুষের তৈরি করা বিধিনিষেধ শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ প্রক্রিয়া পথে বিঘ্নই সৃষ্টি করে থাকে, তার স্বাভাবিক ও সুষম বিকাশের সহায়তা করে না। প্রকৃতিবাদের এই তত্ত্বটি থেকেই আধুনিক শিশু স্বাধীনতার ধারণাটি এসেছে। শিশুর আচরণ, ইচ্ছা, চিন্তা প্রভৃতিকে বাধামুক্তহীন পথে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। উদ্ভাবিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু স্বাধীনতার এই ধারণাকে পূর্ণরূপ দেবার চেষ্টা করেছেন পৃথিবীর প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথ, মন্টেসরী, ফ্রয়েবেল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দে লেখা যেসব কবিতা শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হয়, মৌখিকভাবে যা আবৃত্তি করা হয়, মুখে মুখে যা ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরুষানুক্রমে যা সঞ্চারিত হয় তাকেই ছড়া (Rhyme) বলে। ছড়ার মধ্যে দিয়েই শিশুরা ভীরুতা, লজ্জাবোধ কাটিয়ে উঠতে পারে। বিভিন্ন ধরণের নমনীয়তাবর্ধক ব্যায়াম, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন, একতালে, একছন্দে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ছড়ার মাধ্যমে অভ্যাস করানোকেই বলে ছড়ার ব্যায়াম। ছড়ার মধ্যে দিয়েই শিশুর জন্মাবে সাহিত্যের প্রতি রসবোধ। আমাদের সমাজজীবনে এমন অনেক খেলার প্রচলন আছে যার মধ্যে ছড়ার ব্যবহার তাকে আরও অন্তরঙ্গ ও আনন্দমুখর করে তোলে। এইসব খেলা কেবল শরীরচর্চা নয়, এখানে মনের বা হৃদয়ের সংযোগ ঘটে, ব্যায়াম চর্চার কঠোর শৃংখলাকে সহনীয় করে তোলে, শিশু কিশোরের মানসিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় ছড়া কার লেখা, কার বানানো কেউ জানে না। শিশু শিক্ষার সাথে ছড়া অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিশুর প্রথম জীবন ইন্দ্রিয় ও কল্পনা নির্ভর। ছড়াগুলির একদিকে আছে সাদাসিধে বাস্তব জীবন। ছড়ার, মধ্যে আছে প্রবল ধ্বনিময়তা ও সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য। যার মাধ্যমে শিশুর অন্তরাশ্রয়ী আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতে বিভিন্ন অবদমিত ইচ্ছা ও স্বপ্ন প্রতীকেরই প্রকাশ ঘটে আদিম ছড়াগুলিতে, পরবর্তী সময়ে তা হয়ে উঠতে পারে আরও অনাবিল, অর্থপূর্ণ ও সচেতন, শিশু প্রকৃতির সৃজন। মানব শিশু যে চোখ দিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখে তা সতত সঞ্চরণশীল এবং সদা অনুসন্ধিৎসু। শিশুর বহুমুখী বিকাশ প্রক্রিয়ার সুষ্ঠুতম ও সর্বোত্তম পরিণতি কথাটি বহুলাংশে অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট প্রকৃতির। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে শিশুর বহুমুখী বিকাশ প্রক্রিয়াকে পাঁচটি প্রধান ধারায় প্রকাশ করা যায়। সেগুলি হল শারীরিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, প্রক্ষোভমূলক বিকাশ এবং নৈতিক বিকাশ। শিশুর ক্রম বুদ্ধির বিকাশ, পরিণতবুদ্ধি মানবের অগ্রজ রূপ। যুগে যুগে দেশ ও দেশান্তরের ছড়া এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ জগতের লোকসাহিত্যে শিশুর সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে এমন সুনিবিড় ঐক্য আর কোনো বিষয়েই দেখতে পাওয়া যায় না।

ব্যবহারিক দিক থেকে ছড়ার কতকগুলো মৌলিক প্রকারভেদ আছে। সৌন্দর্য ও রসগ্রহিতার সঙ্গে প্রকার ভেদের কোনও সম্পর্ক নেই। মূলতঃ ছড়াগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) লোকায়ত ছড়া :- এ সমস্ত ছড়া সমাজজীবনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে, যা একটি বিশেষ সময়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ করা যায় না। বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ছড়াগুলিই শিশু সাহিত্য, তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে। যেমন-

খোকন আমাদের সোনা
সেকরা ডেকে মোহর কেটে
গড়িয়ে দেব দানা।।

(খ) রচিত ছড়া :- এ সকল ছড়াতে ছড়াকারদের নাম জানা যায়। বাংলায় আধুনিক ছড়া অনেকে লিখেছেন। লেখনীর কোথাও কোথাও লোকায়ত ঢং-ও দেখতে পাওয়া যায়। কতকগুলো ছড়া আবার চমকপ্রদভাবে নতুন ও ভিন্ন চরিত্রের।

"কুতুর কুতুর ময়না
কাল দেব তোর গয়না।।" বা

"বীর হনুমান ছিলেন দাদু, আমরা নাতি তার
পাকা কলা ছাড়িয়ে খেতে, বেজায় মজাদার।।"

এছাড়াও কিছু সূক্ষ্ম উপ-বিভাগ দেখা যায়। এরকম গ্রাম্য বিষয়ক ছড়াগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথাক্রমে —

(১) ঘুমপাড়ানী ছড়া :-মায়ের কোলে শুয়ে ঘুমপাড়ানী গান শুনতে শুনতে নিদ্রাদেবীর কোলে শিশু ঢলে পড়ছে, মা, মাসীদের মুখে

মুখে ছড়া শ্রবণ করতে করতে মনের হরযে শিশু ভোলানাথ আনন্দ লাভ করছে।

'ঘুমপাড়ানী মাসি-পিসি মোদের বাড়ি এসো
খাট নাই পালং নাই খোকার চোখে বসো।।'

(২) মাতৃহৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহের পরিচায়ক খোকা খুকুর স্তবরূপে ছড়া :- বাস্তবিক নানাভাবে শিশু, দেবতার স্তব করেও মাতৃহৃদয়ের আকাঙ্খা মিটতে চায় না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মগ্ন হৃদয়া বন্দনাকারিণীগণ নব নব স্নেহের ছাঁচে ঢালিয়া এক শিশু দেবতার কত মূর্তিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।"

'ধন ধন ধন
বাড়ীতে ফুলের বন'

(৩) প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছড়া :- মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, শিশু মন গৃহের বন্ধন কাটিয়ে উঠতে চাইছে। লেবুপাতা করমচা, ওরে বৃষ্টি থেমে যা।।

(৪) খেলার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছড়া :- শব্দবিন্যাস, সুরের ঝংকার তার সাথে খেলার আনন্দ শিশু মানসে জাগিয়ে তোলে অদ্ভুত প্রেরণা।

'হাত ধরে আর ঝুঁকে ভাই, আমরা নাচি আমরা গাই।'

(৫) চিত্র বহুল কল্পনা উদ্দীপক ছড়া :- চিত্র যতই অদ্ভুত হোক শিশুমনের কল্পনা প্রবণতা অতি সহজেই কোন কিছু সৃজন করতে সক্ষম। অসংখ্য চিত্র এবং অসংখ্য ঘটনার সমবায়ে মানব জীবনের দু-একটি স্নিগ্ধ অনুভূতি শরৎ কালের মেঘের মত অতি সন্তর্পণে আমাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায় এবং আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় সম্ভাবনা ও প্রত্যাশা নিরন্তর সচকিত হয়ে ওঠে।

'টিয়ের মার বিয়ে, লাল গামছা দিয়ে।'

ছড়া ব্যায়াম বা ছন্দ ক্রীড়ার মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের গুছিয়ে কথা বলবার ক্ষমতা ও শারীরিক সক্ষমতা বাড়ে, ছড়া অত্যন্ত সুনিপুণভাবে শিশু মনে প্রবেশ করে তার সাথে সাথে শিশুর আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বেড়ে যায়, কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটে, আত্মবিকাশ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার সুযোগ ঘটে, মাতৃস্নেহের উষ্ণ স্নেহ মমতার পরশ পাওয়া যায় ও সৃজনী প্রতিভার উন্মেষ ঘটে।

ছড়ার ছন্দ শিশুকে আকর্ষণ করে, লৌকিক ছন্দে ছড়ার মধ্যে এমন মনোহারিত্ব সৃষ্টি করে যার আবেদন শিশু চিত্তে অনিবার্য। ছড়ার শব্দগুলির মধ্যে অবাস্তবতা, অর্থহীনতা, কোমলমতি শিশুকে আকৃষ্ট করে। মা দিদিমা, ঠাকুমা, পিসিমা, কাকিমা, মাসিমারা যুগে যুগে ছেলেমেয়েদের কোলে নিয়ে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, কান্না থামানোর জন্য আদর করে কোলে নিয়ে খেলাচ্ছলে ছড়া বলেছেন। তাই ছড়ার মধ্যে শিশু চিত্ত মাতৃস্নেহের অপূর্ব মাধুরী দেখতে পায় এবং তা শিশু মনকে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করে। ছড়ায় শিশু মনস্তত্ত্ব উপেক্ষিত নয়। চিরন্তন ও সার্বজনীন আবেদন নিয়ে ছড়াগুলির সৃষ্টি হয়েছে। সহস্র ধারায় অপত্য স্নেহের অকৃপণ বর্ষণ ছড়ার ছত্রে ছত্রে এক শান্ত স্নিগ্ধরূপ এনে দিয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি।" উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বনে রঞ্জিত, বায়ু স্রোতে যদিচ্ছা ভাসমান-দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিয়া আসিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশু হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। ছড়া পরিবর্তনশীল। এতে কারো মালিকানার স্পর্শ নেই। শিশু ছড়া ভালোবাসে। শিশুর ভাষা শিক্ষায় ছড়ার স্থান স্থায়ী ও অপরিহার্য। বিশেষ করে প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ছড়াকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে শিশুর যখন শৃংখলহীন অবস্থা তখন ছড়ার মাধ্যমে শিক্ষাদান খুবই কার্যকর। আত্মীয়-স্বজন গৃহপরিবেশ, বিদ্যালয় পরিবেশে শিশু নিজেকে মেলে ধরতে চায়, আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই প্রবৃত্তি "আত্ম সাযুজ্য বোধ"। ছড়ার মাধ্যমে খেলা, সরব আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে শিশুর এই প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়। শিশুর এই প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, সার্বিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে ছন্দক্রীড়ার বিশেষ প্রয়োজন। অনেক ছড়া আজ লোকমুখে বিস্মৃত, অর্ধবিস্মৃত, ও পরিবর্তিত। ঈশ্বর গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুরুসদয় দত্ত বাংলার জনজীবনে মিশে থাকা বহু প্রাচীন ছড়া সংকলিত করার চেষ্টা করেছেন। আধুনিক নগর সভ্যতার যুগে সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু, উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, স্বপন বুড়ো, বিমল ঘোষ (মৌমাছি) সুখলতা রাও প্রমুখ কবি সাহিত্যিকগণ সার্থক ছড়া রচনার মধ্যে দিয়ে ছড়ার অফুরন্ত ভান্ডারকে চেতনার আলোকে আলোকিত করেছেন, মনের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বলেছেন, প্রত্যেক দেশের লোকসাহিত্যেই ছড়া একটি বিশিষ্ট অংশ। ইহা সমগ্রভাবে ব্যক্তি কিংবা সমাজের সচেতন মনের সৃষ্টি নহে বরং স্বপ্নদর্শী মনের অনায়াস সৃষ্টি। তিনি ছড়ার উপর সুদীর্ঘ, সুস্পষ্ট, সুন্দর আলোচনা করে যাত্রাপথকে আরও সুগম করেছেন।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুকেন্দ্রিক। শিশুর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে লক্ষ্য রেখেই পাঠ্যবিষয় ও পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। তাই শিশুর সরল মন, কল্পনা প্রবণ ভাবনা আসক্তি প্রভৃতির উপর লক্ষ্য রেখে ছড়ার মাধ্যমে শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশু ছড়া শুনতে ও পড়তে ভালোবাসে। হাবার্টের পঞ্চ সোপান সূত্র প্রয়োগ করে ছড়াকে শ্রেণিকক্ষে সুন্দরভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের মৌলিক জীবনে এমন কিছু খেলা আছে যেখানে ছড়ার সম্পর্ক ঘটে তাকে আরও অন্তরঙ্গ এবং আনন্দ মিশ্রিত করে তোলে। খেলা, ছন্দ একত্রিত হয়ে ছড়া আমাদের জীবনের অবসর মুহূর্তগুলোকে রমণীয় করে তোলে।

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 6

বাঁচার জন্য বাঁচানো

রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়

(প্রাক্তণ উপাচার্য, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাক্তণ সভাপতি স.পে.আ.)

— মেরো না, মেরো না, আমাকে শেষ করে দিও না। আমাকে বাঁচতে দাও।

— কে? কে এমন মৃত্যুভয়ে আর্তনাদ করছে? কে তুমি?

— আমি পৃথিবী, ধরিত্রী, বসুন্ধরা, আমি রবিঠাকুরের 'সুন্দর ভুবন', যেখানে তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন।

— আমরাও তাই চাই। তবে তোমার আবার মরণ-বাঁচন আছে না কি? পাহাড়-সমুদ্র-জঙ্গল, বিচিত্র বিস্তীর্ণ ভূখন্ড, নদী, এত প্রাকৃতিক সম্পদ, মাটির ভেতরে কত সঞ্চয়—এসব নিয়ে তুমি তো অমর, অক্ষয়, শাশ্বত।

— হ্যাঁ, এসবই আছে। আর আছে তোমাদের মত অজ্ঞ, অসচেতন মানুষজন যারা জানে না যে তাদেরই বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা নিয়মিত গবেষণা করে কী বলছেন।

— তোমার শেষ হয়ে যাবার কথা কে বলেছে?

— সারা বিশ্ব জুড়েই এ বিষয়ে আলোড়ন পড়ে গেছে। অনেক সভা সমাবেশ, সম্মেলন হয়েছে। বিদ্বজ্জনেরা বলেছেন, যেভাবে মানবজাতি তাদের ভোগলালসা মেটাতে আমার সম্পদ লুঠ করছে, আমার পরিবেশের সবদিক দূষিত করে চলেছে তাতে আমার অস্তিত্বের সংকট গভীর হয়ে আসছে।

— সর্বনাশ তুমি না থাকলে আমরা কোথায় যাব?

— ঠিক তাই। তোমাদের সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই তো এত গবেষণা ও সতর্কবার্তা। দেশে দেশে প্রচার চলছে। সরকারের দায়িত্ব নির্ধারিত করে আন্তর্জাতিক চুক্তি হচ্ছে। আবার কিছু লোকের সঙ্কীর্ণ স্বার্থে সে সব চুক্তি ভাঙাও হচ্ছে।

— তা বুঝলাম, কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের দায়ি করছ কেন, আমাদের কি দোষ?

— নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে বলো তো জল নষ্ট কর কি না। হাতমুখ ধোয়া, স্নান করা, জামা-কাপড় কাচা—এসব কাজে ঠিক যতটা জল প্রয়োজন ততটুকুই খরচ করো, অপচয় করো না।

— তা ঠিক। অত মেপে জল ব্যবহার হয়ে ওঠে না।

— তার মানে এর গুরুত্বটা বোঝ না। আমার প্রাণের গভীরে যে জলের ভাণ্ডার আছে তোমাদের দায়িত্বহীন অনাচারের ফলে তা যে তলানিতে ঠেকেছে। তোমরা যাকে 'জীবন' মনে করো সেই জলের জোগান তো আমি আর দিতে পারবো না। এখনই এদেশের কয়েকটি বড় শহরে জলের হাহাকার পড়ে গেছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলেছেন কলকাতাবাসীরা সংযত না হলে আর ২/৩ বছর পরে এই শহরও জলের অভাবে ধুঁকবে।

— তাই নাকি! তবে তো ভারি চিন্তার কথা।

— শুধু চিন্তা করলে হবে না, অভ্যাস পাল্টাতে হবে আজ এই মুহূর্ত থেকে। অন্যদের বোঝাতে হবে, তাদের অভ্যাস পাল্টাবার সংঘবদ্ধ দায়িত্ব নিতে হবে।

— অবশ্যই করব, আজই আসরে গিয়ে কথাটা তুলব। তবে আরও কিছু ভুল কাজ কি আমরা করে চলেছি?

— করছই তো! বায়ুদূষণ কথাটা শুনেছ কি?

— হ্যাঁ শুনেছি। তবে বিশেষ মাথা ঘামাই নি।

— এই অবস্থায় উদাসীন থাকলে আগামী দিনে মাথা ঘামাবার আর সুযোগ পাবে না। সম্প্রতি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে প্রতি বছর বায়ুদূষণ জনিত কারণে ভারতে পনেরো লক্ষ মানুষ মারা যায়। রাজধানী দিল্লির দূষণ মারাত্মক জায়গায় পৌঁছেছে, দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও উদ্বেগ ছড়িয়ে দিয়েছে। কলকাতাও তার কাছাকাছি আছে, কখনো কখনো তাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে।

— কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের কিছু দায় আছে কি?

— কিছুটা তো আছেই। কালীপুজো ও অন্যান্য উৎসবে বাজি পোড়ানোতে মেতে ওঠো না? শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হচ্ছে শব্দদূষণ কমাবার লক্ষ্যে। কিন্তু অন্যান্য বাজি—যেমন তুবড়ি, রংমশাল-এগুলি আওয়াজ করে না ঠিকই কিন্তু এ থেকে যে ধোঁয়া বেরোয় তা বাতাসে মিশে বিপর্যয় ঘটায়। এছাড়া পৃথিবীর তাপ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে যার বড় কারণ গ্রীণ হাউস গ্যাসের বাড়াবাড়ি। এর ফলে প্রকৃতির রাজ্যে যে তাণ্ডব শুরু হয়েছে তা সমাজের সামনে নানান ক্ষতির চিত্র তুলে ধরছে। এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য দরকার প্রচুর গাছ ও জলাভূমি। সেগুলি কিন্তু তোমাদের চোখের সামনেই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। একদল লোভী মানুষ এগুলি চুরি করছে।

— হ্যাঁ জানি। কিন্তু তাঁরা তো বড়, অনেক তাঁদের ক্ষমতা। আমরা ছোটরা কী করতে পারি?

— আজকাল স্কুলের ছেলেমেয়েরা তো বেশ কিছু সামাজিক বিষয়ে দল বেঁধে প্রচার বা আন্দোলন করছে। গ্রেটা থুমবার্গের নাম শুনেছ? সুইডেনের এই ছাত্রীটি একা পরিবেশের রক্ষার লড়াই চালিয়ে বিভিন্ন দেশের সরকারকে বিব্রত করে তুলেছে। সে এখন বিশ্বের প্রথম সারির পরিবেশ সৈনিক। আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও সে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তাকে আদর্শ হিসাবে নিয়ে কিছু কাজ তো করতেই পার।

— আর কোন কোন দিক আছে?

— অনেক কিছু আছে। তবে আজ আর কথা বলতে পারছি না, জানার ইচ্ছেটা যখন জেগেছে তখন যেখান থেকে পারো খবর সংগ্রহ করো। কিছু পড়ো, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো, বড়দের প্রশ্ন করো। আমি আজ পালাই। দেখি, আমার বিনাশকারীর দল আর রক্ষাকর্তাদের মধ্যে কে কতটা এগোল!

(লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রণ করা হল।)

দ্বিধাগ্রস্ত মননে কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন
ও
প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শ্রেণী ২০২১

নতুন পরিচালন সমিতি গঠন হওয়ার পর প্রথম কেন্দ্রীয় কর্মসূচী নেওয়া কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন। ২০১৮ কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলনের পর প্রায় তিন বছর পর এই সম্মেলন। সেই সঙ্গে বার্ষিক শিবির না হওয়ার জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শ্রেণী রুটিন মাফিক করা যায়নি। কারণ অবশ্যই Covid-19। দোলাচল মনে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করছি তখন নদীয়া জেলার শ্রীমা মহিলা সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে তাদের তৈরি শিশুবিভাগ তরুণিমা সবপেয়েছির আসর প্রস্তাব দেয় ডিসেম্বর মাসে একটি কেন্দ্রীয় কর্মসূচী করতে। আলোচনা সাপেক্ষে স্থির হয় ১২ই ডিসেম্বর ২০২১ তরুণিমা সবপেয়েছির আসরের ব্যবস্থাপনায় এবং শ্রীমা মহিলা সমিতির সহযোগিতায় শ্রীমা মহিলা সমিতির '**বিকল্পে**' কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন ও প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শ্রেণী অনুষ্ঠিত হবে। ১২টি জেলার ১৮টি অঞ্চল থেকে ৭০ জন কর্মী-সংগঠক অংশ নিয়েছিলেন এই কর্মসূচিতে।

১০ই ডিসেম্বর 'বিকল্প প্রাঙ্গণে' আসর পতাকা তোলেন শ্রীমা মহিলা সমিতির কর্ণধার এবং সবপেয়েছির আসরের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য শ্রীমতী বাণী সরস্বতী, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন শ্রীমা মহিলা সমিতির পরিচালক শ্রী জ্যোতির্ময় সরস্বতী। তরুণিমা সবপেয়েছির আসরের কর্মসূচী কয়েক বছর বন্ধ ছিল। দুজনেই আশা প্রকাশ করেন মূলকেন্দ্রের এই কর্মসূচী তরুণিমা আসরকে আবার স্রোতস্বতী করে তুলবে। সবপেয়েছির আসরের লক্ষ্য এবং আদর্শের প্রতি আস্থা রেখে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে সকলকে নিষ্ঠাবান হয়ে একযোগে কাজ করতে বলেন। আগত সকলকে স্বাগত জানান মূলকেন্দ্রের সংগঠন সচিব তিমির বরণ সরস্বতী। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান সহঃ মূলসত্যসেবী জয়দেব বারুই। প্রতিনিধি পরিচয়, সভাপতিমণ্ডলীর নাম ঘোষণা, সম্পাদকমণ্ডলী ও পর্যবেক্ষকদের নাম ঘোষণার মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা হয়।

সংগঠন সচিব তিমির বরণ সরস্বতী প্রস্তাবনায় আগামী দিনের কর্মসূচী নির্ণয় করতে মূলকেন্দ্র ও অঞ্চল প্রতিনিধিদের কর্ম ও চিন্তার সমন্বয়ের ওপর জোর দিতে অনুরোধ করেন। শুধুমাত্র মূলকেন্দ্রের গুটি কয়েক কর্মীর ওপর নির্ভর করলে সংগঠন এগোতে পারবে না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সকলকে এগিয়ে এসে কাজ করতে হবে। সংগঠনে মনান্তর, মতান্তর হতেই পারে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে আমরা সবাই এক, একে অপরের হাত ধরব। সব কিছুকে দূরে ঠেলে দিয়ে সংগঠনতরী এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সব রকমের বিতর্ক আলোচনায় সকলকে অংশ নিতে হবে।

সংগঠন সচিবের পর অন্যান্য সচিবরা প্রস্তাবিত পরিকল্পনা (যা মুদ্রিত আকারে সমস্ত প্রতিনিধিকে দেওয়া হয়) ও প্রাসঙ্গিক আরও কিছু বিষয়ে আলোকপাত করেন। সচিবদের পেশ করা প্রস্তাবগুলোর ওপর আলোচনায় অংশ নেন অঞ্চল প্রতিনিধিবৃন্দ। অতিমারীর কারণে বেশ কয়েকমাস আসরের কর্মসূচি বন্ধ ছিল। সেই প্রেক্ষিতে কী করেছি সেই দিকে প্রতিবেদন না রেখে অতিমারী থেকে সবপেয়েছির আসর যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তাই দিয়ে অতিমারী জয় করে আমরা আগামী দিনে কী করব সেই দিকেই বেশি করে আলোকপাত করা হয়েছে। সবপেয়েছির আসরের প্রবাহমান কর্মসূচীর ধারাকে ব্যাহত করে অতিমারী আমাদের সকলের মনে জায়গা করেছে বৈদ্যুতিন অন্তর্জাল, চিঠি, বিজ্ঞপ্তির জায়গায় এসেছে WhatsApp। অনুষ্ঠানের প্রচার এবং সংবাদের জায়গা করে নিয়েছে Facebook। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সবপেয়েছির আসরে ৭৫ বছরের ইতিহাস কেবলমাত্র বই-এর মধ্যে কাগজেই রয়ে গেছে। কাগজ নষ্ট হয়ে গেলে "কোথায় পাবো তারে"। খুঁজলেও পাবো না সেই মনোভাবে অতিমারী যখন আমাদের অন্তর্মুখী করে দিয়েছিল, সেই মননে খয়রোজ মণ্ডল, সৌরেন শর্মা-র মত কয়েকজন প্রতিনিধি ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য Digital মাধ্যম গ্রহণ করার জন্য জোর সওয়াল করেন এবং সকলের সহযোগিতা আশা করেন। অপরদিকে ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট চাইল্ড প্রোটেকশন ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী প্রদীপ কুমার মল্লিক আমাদের সংগঠনের কার্যধারা সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং আলোচনার মাধ্যমে সকল রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সংগঠনের সভাপতি কমলেশ চট্টোপাধ্যায় করোনার ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে যারা এসেছেন তাদের সবপেয়েছির আসরের বীর সেনানী বলে উল্লেখ করেন। তিনি আশা করেন আগামী দিনে আসরের কাজ করায় কর্মীদের সদিচ্ছা ও আগ্রহ এবং স্বেচ্ছাশ্রম বিফলে যাবে না।

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শ্রেণী মূলতঃ তিমির সরস্বতী এবং শিক্ষণ সচিব তরুণ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে হয়। কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক অপরেশ মজুমদার, গৌতম সূত্রধর, বিকাশ প্রামাণিক, গণেশ মুখার্জি সহযোগিতা করেন। প্রশিক্ষকদের রায়বেঁশে নৃত্য প্রদর্শন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শ্রেণীকে আরও উজ্জীবিত করে। যুগ্ম কর্মসূচীর শেষ লগ্নে সবপেয়েছির আসরের পক্ষ থেকে শ্রীমতী বাণী সরস্বতী এবং শ্রী জ্যোতির্ময় সরস্বতীকে স্মারক প্রদান করে সম্বর্ধিত করা হয়।

সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী জবাবী ভাষণে বলেন, আগামী দিনে আসর সংগঠনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। পরম্পরা বজায় রেখে নতুন নতুন চিন্তাধারার মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ করে শিশু ও কিশোরদের সার্বিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি পরিচালন সমিতিতে বিশদভাবে আলোচনা করে আগামী কর্মসূচী রূপায়ণ করা হবে।

সম্মেলন পরিচালনায় মূল ভূমিকা নেন কার্যনির্বাহী সভাপতি অপূর্ব গঙ্গোপাধ্যায়। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে কার্যনির্বাহী সভাপতি উপস্থিত সকল প্রতিনিধি এবং ব্যবস্থাপক তরুণিমা সবপেয়েছির আসরকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন আমরা প্রত্যয়ী, আমাদের আছে আত্মবিশ্বাস। সাময়িক সংশয়, সঙ্কট থাকলেও কর্তব্য, আদর্শ, লক্ষ্যর পরম্পরায় আমরা অবিচল। আশা করি নবীন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করে আমাদের প্রিয় সংগঠন শতবর্ষের দিকে এগিয়ে যাবে। শ্রীমা মহিলা সমিতির সার্বিক সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন ও প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শ্রেণী ২০২১ প্রাণবন্ত পরিবেশে শেষ হয়।

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 8

অস্তিত্ব সংকট

অনিন্দ্য মুখার্জি

ভাইফোঁটার দিন, ১২৮২৭ হাওড়া-পুরুলিয়া এক্সপ্রেস ৫টার ট্রেনটা ছাড়লো বেশ দেরি করে, প্রায় দুঘণ্টা লেট।

একটা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক-এর জুনিয়র অফিসার হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছি কিছুদিন আগে, এখন পোস্টিং হয়েছে মেদিনীপুর-এর গোয়ালতোড়-এ। কলকাতা থেকে মেদিনীপুর স্টেশন আড়াই ঘন্টা আর স্টেশন থেকে গোয়ালতোড় মোটামুটি ৪০ কি.মি.। কলকাতা হলে এক ঘন্টায় হয়ে যেত তবে ওখানে মনে হয়না রাস্তা অতটা ভালো হবে, তবে ঘন্টা দুয়েক বড়জোর। ভাইফোঁটার পরদিন নতুন জায়গায় কাজে যোগ দিতে হবে তাই দুপুরে দিদির বাড়ি ভাইফোঁটার জম্পেশ খাওয়াদাওয়া করে উঠে বসেছি এই বিকেলের পুরুলিয়া এক্সপ্রেসে। এমনিতে সাড়ে ৭টা নাগাদ পৌঁছে যাওয়ার কথা স্টেশনে, তবে লেট করে পৌঁছতে সাড়ে ৯টা বাজবে হয়তো।

কানে হেডফোন দিয়ে গান শুনতে শুনতে জানলার ধারে ট্রেনে যেতে ভালোই লাগছিলো, বেশ হিমেল হাওয়ার একটা স্পর্শ। এবারে ভূত চতুর্দশীতে ভেবেছিলাম একটা ভূতের গল্প লিখবো, কিন্তু কোনো প্লট-ই ঠিক জমলো না। তাই গান শুনতে শুনতে ভাবছিলাম কি লেখা যায়। যাই হোক, আমার এখন প্রচুর সময়। গোয়ালতোড়ের জঙ্গলে কে বলতে পারে হয়তো কোনো চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা হবে। অফিসের কাজের পর তো সময়ই সময়—আমার এটা ভাবতেই মনটা আরও বেশ ভালো হয়ে গেল। দশটায় এসে পৌঁছলাম মেদিনীপুর স্টেশনে।

দোটানায় ছিলাম, এত রাতে গোয়ালতোড়ে যাওয়াটা ঠিক হবে নাকি স্টেশনে কাটিয়ে দেব রাতটা। তারপরে ভাবলাম আমার আর ভয় কিসের। তাছাড়া যদি তেনাদের দেখা পেয়েই যাই বেশ একটা বলার মতো ব্যাপার হবে। রাত হয়েছে এদিকে স্টেশনেও গোয়ালতোড়ের কোনো প্যাসেঞ্জার নেই। অগত্যা অনেকটা বেশি টাকায় একটা ভ্যানগাড়িকে রাজি করালাম। দুপুরে ভাইফোঁটায় গলদা চিংড়ি আর দানাপুরী খাসির মাংস খেয়ে পেটটা বেশ ভার হয়ে আছে। খিদেও পায়নি একেবারেই, আর তার সাথে এই ভ্যান গাড়ির দুলুনি—আহ্ কি ঘুম নেমে আসছে চোখে।

চারদিকে গাছগাছালি, বনবাদাড়। একদম জঙ্গলমহল বলা চলে। নতুন এলাম তো তাই মন্দ লাগছিলো না। এখানকার একতলার বাড়ির চাবিটা কলকাতার অফিস থেকেই সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে। যত রাত-ই হোক, গিয়ে পৌঁছলে আর চিন্তা নেই। এইসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি আর খেয়াল নেই।

ঘুম যখন ভাঙলো দেখি, ভ্যানগাড়িটা সরু একফালি রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে। দুদিকে জঙ্গল আর কেউ কোথাও নেই। আচ্ছা বে-আক্কেলে লোক তো, এই রাতে গাড়ি থামিয়ে লোকটা গেল কোথায়? লুঠপাটের মতলব নেই তো? অজানা আতঙ্কে শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। মনে হলো দূর থেকে কাদের যেন আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। হাতের ব্যাগটা নিয়ে গাড়ি থেকে নামলাম। আওয়াজের উৎসমুখ শুনে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম। এবারে একটু ভয়-ভয় করতে লাগলো। নাহ্, রাতটা স্টেশনে কাটিয়ে দিলেই দেখছি ভালো হতো। ওই দূরে যেন কিছু দেখা যাচ্ছে যদিও আলো খুব-ই কম, তবে অন্ধকারে কতগুলো লোক যেন একসাথে জটলা করে কি করে চলেছে আর নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করছে। সবাই একমগ্ন হয়ে কাজ করছে, আমি কাছে গিয়ে ডাকলাম, দাদা শুনছেন? কেউ যেন গ্রাহ্য-ই করলো না। কি করছিলো নিজেদের মধ্যে তাই করে যেতে লাগলো। প্রচুর কাগজ-পত্র নিয়ে প্রায় আবছা অন্ধকারের মধ্যে। এবারে একটু গলা খাকারি দিয়ে বেশ জোরে বললাম এই যে দাদা, শুনছেন? কী আশ্চর্য আমার কথায় না কেউ কান দিলো, না কেউ শুনতে পেলো বলে মনে হলো। এরা সবাই কালা নাকি, কাছে গিয়ে এবারে একজনের হাত ধরে হাতছানি দিলাম, দাদা, শুনছেন? সর্বনাশ, এরা তো আমার হাতের স্পর্শ-ও পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। এরা ভূত নাকি? ভাবতেই ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। কিন্তু ভূত হলে তো উল্টোটা হয় শুনেছি। ভূত মানুষ কে দেখতে পায়, মানুষ ভূতকে নয়। তাছাড়া আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না, হাতের স্পর্শ অনুভব করছে না। এবারে একটা দ্বিতীয় চিন্তা মাথায় এলো। গাড়িতে আসতে আসতে কোনোভাবে ভয় পেয়ে টেয়ে আমারই হার্ট ফেল করে যায়নি তো? আমি নিজেই ভূত নাকি? তাই এরা দেখতে শুনতে পাচ্ছে না। গায়ে চিমটি কাটলাম, বেশ লাগলো। কোনো সন্দেহ নেই আমি দিব্যি বেঁচে বর্তে আছি আর এরাই ভূত। এবারে বেশ খানিকটা বল এলো বুকে। যাক, ভূতের সাক্ষাৎ পেয়ে গেছি। ভূত চতুর্দশীতে ভুতুড়ে লেখাটা না দিতে পারলে কি হবে একদম ভূতের সাথে লাইভ আড্ডা। ঘন্টাখানেক সঙ্গে ভূত। তিয়াত্তর হাজার পাঠক এই প্রথম পড়বে জ্যান্ত ভূতের অভিজ্ঞতা। আনন্দে নেচে উঠতে ইচ্ছে হলো। আমি বুঝে গেছি এরা যখন আমায় দেখতে শুনতে পাচ্ছে না আর যাই হোক এদের থেকে আমার কোনো ক্ষতির আশংকা নেই।

এদের কথা বার্তা পুরোপুরি বোধগম্য না হলেও হাবভাবে যা বুঝলাম গণনা চলছে, ইলেকশন হবে ভূতেদের। জন-গণনার বদলে ভূত গণনা। এতো হওয়ারই কথা, এত বছর ধরে লাখ লাখ মানুষ মরে ভূত হয়েছে দেশে-বিদেশে গ্রামে-গঞ্জে। এখন অস্তিত্ব সংকট শুরু হয়েছে এদের। তাছাড়া ভূতেদের বিয়ে হয় কিনা জানা নেই, ছেলেপুলে হয় কিনা কে জানে! আচ্ছা মানুষ মরলে তো ভূত হয়, ভূত মরে কী হয়? দেখা পেয়েছি যখন সব জেনে যাবো, তবে এবারে চল্লিশ লাখ ভূত হয়তো বাস্তু ছাড়া হবে ভূত-গণনার পরে। এটা ভেবে আবার একটা চিন্তা শুরু হলো। এত ভূত যাবে কোথায়? মানুষদের সাথে লড়াই না লেগে যায়। যদিও আমি ভূত না এরা ভূত এই ব্যাপারটারও একটা মীমাংসা করা

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 9

দরকার। কারণ ভ্যান গাড়িতে ওঠার পরে আমার আর বিশেষ কিছু মনে পড়ছে না। আরেকটা মানুষ চাই ঠিকঠাক, তাহলে বোঝা যাবে আমি নিজে আদৌ কি? ভূতেদের ওদিকে অস্তিত্ব সংকট আর এদিকে আমার নিজের চরম সংকট। মানুষ না ভূত নাকি-দুই এর মাঝামাঝি।

গণনার কাজ কাগজ-কলমে চলতে চলতে ভূতেদের ডিনার টাইম হয়ে গেল। আমাকে কেউ গ্রাহ্যই করছে না। এরা খাবার জন্যে দেখলাম অনেকে গোল করে বসে পড়লো। দেখি কি একটা অদ্ভুতুড়ে যন্ত্র, অনেকটা জেরক্স মেশিন আর মাইক্রোওয়েভ-এর মিশেল কিছু। তাতে করে একটা পিজ্জা দিচ্ছে আর ক্লোন হয়ে বেরিয়ে আসছে অনেকগুলো করে পিজ্জা। এরা অনেক উন্নত হয়ে গেছে, মানতেই হবে। ভূতের ভবিষ্যৎ নাকি ভবিষ্যতের ভূত সব কিরকম যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। সবাই মিলে গোগ্রাসে খাচ্ছে এক একটা পিজ্জা। আমার মাথায় একটা দুর্বুদ্ধি খেলে গেল। চিরকাল ভূতেরা মানুষের খাবার চুরি করে খেয়েছে। আজ এদের একটা পিজ্জা আমি চুরি করে খাবো। ফুড জেরক্স বানানো পিজ্জা! যেই না ভাবা সেই কাজ। একটা পিজ্জা হাত বাড়িয়ে নিয়ে চট্‌পট আমার কাঁধের ঝোলায় চালান করে পেছন ফিরতেই দেখি একসাথে সবাই মিলে ডাকছে আমায়—বাবু, এই বাবু, কী করছেন? সর্বনাশ, আমি ধরা পড়ে গেছি। সব ভূতে অট্টহাস্য করছে, আমার শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত নামছে। সবাই আমার দিকে আঙুল উঠিয়ে বলছে, এই বাবু, কী করছেন? সবাই এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আর পালাবার পথ নেই। আর নিস্তার নেই। মরে ভূত হবো আর এদিকে ভূত সমাজে আমি একজন অনুপ্রবেশকারী আর ভূত গণনায় আমার নাম পর্যন্ত নেই। ভূতের রাজ্য থেকে বিতাড়িত হবো। আমার আমিত্বের শেষ। মৃত্যুর বেড়াজাল গ্রাস করছে আমায়। সবাই মিলে ধাক্কা দিচ্ছে আমায়। ধড়মড় করে ওদের হাত ছাড়াতে গিয়ে জেগে উঠলাম—কোথায় কি, এই তো গাড়িতে বসে আছি আমি। ৩-৪জন লোক আর ড্রাইভারটা সবাই মিলে আমাকে ডাকছে—বাবু, এই বাবু, কী করছেন, উঠুন পৌঁছে গেছেন তো—কী ভয়ানক ঘুম আপনার!

চোখ মেলে চেয়ে দেখি আমার কর্মস্থলের অদূরে আপাত অস্থায়ী গন্তব্যে পৌঁছে গেছি। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো যেন। নাহ্, দিদির বাড়িতে ভাইফোঁটার গুরুপাক আর এই জঙ্গলের মধ্যে ভ্যান গাড়ির দুলুনি সব মিলিয়ে কি ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখে ফেলেছি। ভাবতেই হাসি পেলো। একগাল হেসে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ি থেকে নেমে একতলার চালাঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

সবাই আস্তে আস্তে যে যার ঘরে ফিরে গেল। এগিয়ে গিয়ে দরজা খোলার জন্য কাঁধের ঝোলার মধ্যে হাত ঢোকালাম। হাতে কী যেন ঠেকছে, দেখতে গিয়ে ব্যাগ ফাঁক করে দেখি, আস্ত একটা পিজ্জা!!!!

মণিমহেশ যাত্রা

অসীম দাস (আধিকারিক প.ব. সরকার)

শৈবতীর্থ হিসাবে তিব্বতের মানস কৈলাস যেমন, হিমাচলের মণিমহেশও তাই। পিরামিড আকৃতির কৈলাস পর্বতের সঙ্গে সাদৃশ্যের কারণে লোকে মণিকৈলাস বলে, আবার চাম্বা জেলায় অবস্থিত বলে চাম্বাকৈলাসও বলা হয়। কৈলাসের পায়ের কাছে যেমন মানস হ্রদ তেমন মণিকৈলাসেরও পায়ের কাছে আছে মণিমহেশ হ্রদ। কথিত আছে ভগবান শিব স্বয়ং মণিমহেশ পর্বত তথা হ্রদ সৃষ্টি করেন এবং শিব-পার্বতী এখানেই অবস্থান করেন।

প্রত্যেক বছর ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী থেকে রাধাষ্টমীর ১৫দিন মণিমহেশ যাত্রার সময়। সে সময় যাত্রীসাধারণের রাত্রিবাসের তাঁবু ও তাঁদের ভোজনের জন্য ভান্ডারা বসে, সরকার বিশেষ উদ্যোগ নেয়। তবে সাধারণ পর্বতপ্রেমী মানুষজন জুলাই থেকে অক্টোবর সময়ে স্থানীয় নদী, উপত্যকা, পর্বত, পার্বত্যলেকের সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসেন। তখন অবশ্য থাকার তাঁবু, খাবারের আয়োজন নিজেদের উদ্যোগেই করে নিতে হয়। আমরা চার বন্ধু ট্রেকের মজা উপভোগের অতিরিক্ত মণিমহেশ যাত্রার উষ্ণতাও অনুভব করতে চেয়েছিলাম, তাই যাত্রার সময়টাতেই গেছিলাম। হাওড়া থেকে হিমগিরি এক্সপ্রেস ধরেছিলাম ১০ সেপ্টেম্বর।

মণিমহেশের নিকটবর্তী বড় শহর চাম্বা, চাম্বা জেলার সদরও বটে। চাম্বা থেকে ভারমোর (৬৫ কিমি.) হয়ে হাডসর (১২ কিমি) যেতে হয়। হাডসর থেকে ১৪ কিমি হেঁটে মণিমহেশ পর্বতের পাদদেশে গৌরীকুণ্ড এবং মণিমহেশ লেক। যাত্রার অন্তিম ও মূলকেন্দ্র সেটিই।

ট্রেন থেকে চাক্কি ব্যাঙ্ক স্টেশনে নেমে অটোয় পাঠানকোট বাস স্ট্যান্ডে যাই। ততক্ষণে বেলা তিনটে। দিনের শেষ বাসটাও তখনই পেয়ে গেলাম। চাম্বা (১২৫ কিমি) যেতে পাঁচ ঘন্টা লাগবে বলল। ঠিকই, রাত আটটা লাগল পৌঁছতে। খবর পেলাম ভারমোর যাবার বাসও মিলবে। এ পথে এত রাতে বাস চলার কথা নয়। এখন যাত্রা উপলক্ষে বিশেষ বাস। কন্ডাক্টরকে প্রশ্ন করে জানলাম, বাসে ভারমোর যেতে রাত এগারোটা বেজে যাবে। কিন্তু অত রাতে গিয়ে হোটেল পাব? আমাদের জল্পনার উত্তর পেলাম তাঁরই মুখে—'হাঁ, জরুর মিলেগা, চিন্তা মত্ করো জী।' অভয় পেয়ে বাসে উঠে বসলাম। ততক্ষণে অল্প অল্প বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ি পথে নতুন করে যাত্রার সিদ্ধান্ত কি ঠিক হল? খানিক পর বৃষ্টির বেগ বাড়ল। রাস্তা যেমন সংকীর্ণ তেমন পাশেই খাদ থাকায় তা বিপদসঙ্কুলও বটে। বাস হেলে দুলে চলেছে। গৌতমদার ভয়ে কথা বন্ধ।

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 10

বললাম, আমরা বুধিল নদীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছি, এটাই পরে ইরাবতীতে মিশছে। গৌতমদা তবু চুপ। অভয় দিয়ে বললাম, পাহাড়ি রাস্তা তো এরকমই হয়, ড্রাইভার পাকা, অত চিন্তা করবেন না।

বাসে স্থানীয় লোকজন যারা ছিল তারা এক-দুজন করে নেমে গেল, শেষে আমরা ক'জন মাত্র। মাঝপথে একটা ভান্ডারার সামনে বাস দাঁড় করিয়ে দিলেন ড্রাইভার সাহেব। বললেন, 'ইধার খা লো আপলোগ'। আমাদের তো খিদে পেয়েই ছিল। অতএব বিনা বাক্যব্যয়ে বিনি পয়সার ভোজন সারা গেল।

ভাত-ডাল-সবজি-চাটনি-পায়েস। ভান্ডারার কর্মকর্তারা আমাদের মতো যাত্রীদের ডেকে ডেকে খেতে বলছেন, আমাদের পুণ্যে তাদেরও পুণ্য। শেষ পর্যন্ত রাত সাড়ে বারোটায় আমাদের বাস গন্তব্যে পৌঁছল। কন্ডাক্টর ঠিকই বলেছিলেন, অত রাতেও হোটেল পেতে অসুবিধা হয়নি আমাদের।

ভারমোরের উচ্চতা সাত হাজার ফুট। অতীতে সপ্তম থেকে দশম শতক পর্যন্ত চাম্বার রাজধানী ছিল ব্রহ্মপুর, যা ক্রমে লোকের মুখে মুখে ভারমোর নাম নিয়েছে। সপ্তম শতকে নির্মিত সুউচ্চ চৌরাশিয়া মন্দির ভারমোরের প্রধান আকর্ষণ। বেলেপাথর নির্মিত এই শিবমন্দির এখন ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ দেখাশোনা করে। এখানে গদ্দী সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। অতীতে এরা পাহাড়ে পাহাড়ে মেষ ও ছাগল চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। এখন আপেল, আখরোট, ভুট্টা ইত্যাদির চাষবাস করে।

ভারমোরে একদিন ছিলাম। চৌরশিয়া মন্দির ছাড়া ৩ কিমি দূরের ব্রাহ্মণী মন্দির দেখে সময় কাটে। প্রায় সব বাড়িতেই আপেল গাছ। পথের পাশে দাড়িপাল্লা নিয়ে আপেল বেচতে বসেছে লোকজন। এক বাড়ির উঠোনে হিমাচল টুপি ওভারকোট পরা বৃদ্ধ বসে আয়েশে হুঁকো টানছিলেন। পিছনে কাঠের ঘর কারুকাজ করা। গলায় কানে ভারী গয়না আর সালোয়ার-কামিজ পরা প্রৌঢ়া একই উঠোনে কর্মব্যস্ত। ফটোগ্রাফি করার সুন্দর বিষয়। ফটো তোলা হলে বৃদ্ধ ইশারায় কাছে ডাকলেন। সামনে যেতে ডাঁই করা আপেলের থেকে দুহাত ভরে আপেল দিলেন খেতে। পরে প্রভাতকে ঘটনাটা বললে ও বলল, 'শুধু তোমাকে নয়, লোকে আমাকেও ভালবাসে, এই দ্যাখো'। বলে অনুরূপ ভালবাসার দান মেলে ধরল।

পরদিন মণিমহেশ যাচ্ছি। প্রথমে জিপে হাডসর গেলাম। গাড়ি-ঘোড়া কুলি-যাত্রী মিলিয়ে ঠাসা ভিড়। কুগতি পাস হয়ে নেমে আসা কুগতি নালা আর মণিমহেশ থেকে নেমে আসা মণিমহেশ নালা বা মণিনালা হাডসরে এক হয়ে বুধিল নালা নামে নিচে নেমে যাচ্ছে। আমরা, বলাবাহুল্য, মণিনালার পথ ধরব। সাধারণ পূণ্যার্থী, সাধু-সন্ন্যাসীই বেশি। আমাদের মতো পিঠে রুকস্যাক নিয়ে চলার লোক বিশেষ নজরে পড়ে না। অত্যুৎসাহী লোকজন যেতে যেতে 'জয় শিবশংকর' 'জয় মণিমহেশ' ধ্বনি তুলছে। গুড়িগুড়ি বৃষ্টি। পথ পিছল, রেনকোট পরে সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে। দু-এক কিমি বাদে বাদে ভান্ডারা। গরম চা-দুধ থেকে সবজি-পুরি, ডাল-ভাত, মিঠাই-মোরব্বা পর্যন্ত মিলবে। যেটা খুশি যত খুশি খাও। বিনা পয়সায়।

পাইন-ওক-দেওদারের ঘন সবুজ বনের মধ্য দিয়ে পথ। পাশে মণিনালা বা মণিগঙ্গার কলধ্বনি, ঝিঁ ঝিঁ-র স্বর। ৬-৭ কিমি পর ধানচো। উঁচু পাহাড়-ঘেরা এখানটাতেই বেশিরভাগ লোক রাত্রিবাস করে। সেইমতো পর্যাপ্ত ভোজন-ভান্ডারা এবং তাঁবু আছে। আমরা ন'টা নাগাদ হাঁটা শুরু করেছিলাম। এখন দেড়টা বাজে। আরও ৬-৭ কিমি গেলেই তো গৌরিকুন্ড বা মণিমহেশ। আমরা হাঁটতে থাকলাম। ধানচু বা ধানচো ছাড়াতেই অসাধারণ ঝরণা, পাহাড়ের গা বেয়ে মণিনালার ওপর আছড়ে পড়ছে। এখানের উচ্চতা হাজার দশেক ফুট। এরপর আরও চড়াই। বড় গাছের এলাকা ছাড়িয়ে এসেছি। এরপর শুধু কাঁটা জাতীয় ছোটো গাছ, ঘাসের বুগিয়াল। চড়াই বাড়ার কারণে চলার গতি কমতে থাকছে। সুন্দরাশি, ভৈরঘাটি ছাড়িয়ে গৌরিকুন্ড পৌঁছতে সন্ধ্যা নেমে গেল। সারাদিনে প্রায় তেরো কিমি হাঁটা হয়েছে, প্রায় তেরো হাজার ফুট উচ্চতায় এসে উঠেছি। তাই ঠান্ডাটাও তেমন। জেনারেটরের শক্তিতে বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বলছে, আলোর জোর নেই। অন্ধকারে ঠান্ডায় বেশি ঘোরাঘুরি না করে ভান্ডারায় ভোজন সেরে আটটার মধ্যেই ভাড়া-টেন্টে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

সকালে উঠে গৌরিকুন্ড দেখলাম। ছোট্ট কুন্ড। ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি, তার মধ্যেও দেখছি কিছু মহিলা কুন্ডে স্নান করছে। স্নানের পর পাশের শ্বেত পাথরের পার্বতী মূর্তিতে পুজো দিচ্ছে। আমাদের নজর সামনের সাড়ে আঠারো হাজার ফুট উচ্চতার দৃষ্টিনন্দন কালো গ্রানাইট পাথরের পর্বতটিতে। এর খাঁজে খাঁজে তুষার জমে। পর্বতের পিছন থেকে সূর্যের প্রথম আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। হিমাচল প্রদেশের সর্বোচ্চ এই পর্বতই মণিমহেশ। আরও সাত-আটশো মিটার হেঁটে উঠলে পাব মণিমহেশ কুন্ড। ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে বাকি পথটা নিয়ে যাবার জন্য ঘোড়ার মালিকদের অনুরোধ। অবশ্য সারা পথেই এরকম অনুরোধ পেয়েছি। আমরা তো হাঁটতেই বেশি মজা পাই। তাই অনুরোধ উপেক্ষা করে মণিমহেশ কুন্ডের দিকে হাঁটতে থাকলাম। পাশেই অস্থায়ী হেলিপ্যাড। পয়সা খরচ করলে ভারমোর থেকে হেলিকপ্টারে চড়েও আসা যায়।

মণিমহেশকুন্ড খানিকটা আয়তাকার, গৌরিকুন্ডের কয়েক গুণ বড়। চারপাশ পাথরে বাঁধানো। কুন্ডের তিনদিক ঘিরে রাত্রিবাসের অস্থায়ী তাঁবু, পুজোর সামগ্রী বিক্রির দোকান। মহিলাদের স্নানের ঘর। আমাদের মধ্যে প্রণবদা কুন্ডের কোমর জলে নেমে স্নান করল। আমরা কুন্ডের চারদিকে পরিক্রমা করে মানুষজন, তাদের স্নান করা, পুজো দেওয়া, কমন্ডুলু-ত্রিশূলধারী সাধুসন্তদের কর্মকান্ড দেখতে দেখতে ঘুরে ফিরে মণিমহেশ পর্বতের দিকে চোখ রাখছিলাম, ফটো তুলছিলাম। এভাবেই ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি-উষ্ণতা যতটা পারলাম অনুভব করলাম, দুপুর পর্যন্ত কাটিয়ে ধীরে ধীরে নামার পথ ধরলাম। মণিমহেশ যাত্রা সফল, সেই খুশিতে চাম্বা, ডালহৌসিতে দু-একদিন করে কাটিয়ে ঘরে ফিরলাম।।

সবপেয়েছির আসর ও শিশু-কিশোর

সুমিত্রা গায়েন, সংঘমিত্রা, চরৈবেতি, স.পে.আ.

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই একটি শিশু জন্মানোর পর তার বোধ হওয়া পর্যন্ত সে তার মায়ের সাহচর্যে লালিত-পালিত হয়। মায়ের মাধ্যমেই স্বাভাবিক নিয়মেই তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে। সে চিনতে শেখে তার পরিবারের লোকজনকে। তাই, একটি শিশুর প্রথম শিক্ষক তার 'মা'। 'মা' ও 'শিশু' এই দ্বৈত শব্দের গভীর অর্থের মধ্যে কোন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনীতির গন্ধ নেই—আছে শুধু অনাবিল আনন্দ, স্নেহ, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। একজন মায়ের পরম মমতা, স্নেহ, ভালোবাসা ও কঠিন অনুশাসনে একটি শিশুর মানসিক বিকাশ শুরু হয়। এক্ষেত্রে তার পরিবারের ভূমিকাটিও খুব গুরত্বপূর্ণ। যেকোন শিশু সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেও সে প্রকৃত মানুষ হওয়ার প্রথম পাঠটি পায় তার পরিবার থেকেই। বাবা-মা, দাদু-ঠাকুমা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যে একসঙ্গে বড় হয়ে ওঠা; খেলাধূলা, আনন্দ, সুখ-দুঃখ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সহজাতভাবেই শিশুদের মনে বিভিন্ন ভালো-মন্দ গুণের সমাহার ঘটে। পরিবারের সদস্যদের মর্যাদা, মানবিকতা, ধৈর্য, সুশিক্ষা, পরধর্মসহিষ্ণুতা, মনুষ্যত্বতা, আত্মমর্যাদা বোধ, নিয়মশৃঙ্খলা, পারিবারিক অনুশাসন, একাত্মতা ও বন্ধন যত দৃঢ় হবে তার প্রভাব শিশুমনে শৈশব থেকেই পড়ে যা তার মানসিক গঠনকে মজবুত করে।

একবিংশ শতকে পরিবার কথাটির মধ্যেই প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। এখন পরিবার বলতে বাবা, মা ও সন্তান। 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার'—এ ধারণা পরিবার পরিকল্পনার মধ্যে থাকলেও 'দাদু-ঠাকুমা'—এ সুখী পরিবার থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাদ পড়ে গেছে। আর বাবা-মা উভয়েই যদি উপার্জনকারী সদস্য হয় তাহলে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিশুদের সঙ্গী হয় মোবাইল ফোন ও বোকাবাক্স। আর সেইসঙ্গে ছবি আঁকা, নাচ-গান, যোগব্যায়াম, সাঁতার শেখা ও অতিরিক্ত পড়াশোনার চাপে জর্জরিত শিশুমনে মানসিক বিকাশের পরিবর্তে মানসিক চাপ তৈরি হয়। এজন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশুরা খিট্‌খিটে, বদ্‌মেজাজি হয়ে পড়ে এবং একাকিত্বে ভুগতে থাকে। আর এখানেই প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় সবপেয়েছির আসরের।

"সবপেয়েছির আসর ও শিশুকিশোর"—এই শিরোনামের প্রেক্ষিতে আলোচনার আগে শিশু-কিশোর ও অভিভাবকদের সবপেয়েছির আসর সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। ১৯৪৫ সালের ২৯ জুলাই শিশু-সাহিত্যিক অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো নামে পরিচিত) "সবপেয়েছির আসর" প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সবপেয়েছির দেশ" কবিতার নাম অনুসরণে কবি সুনির্মল বসু "সবপেয়েছির আসর" নামকরণ করেন। সারা ভারতে এতো বৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী, অরাজনৈতিক, সুসংগঠিত ও শৃঙ্খলাপরায়ণ শিশু-সংগঠন বিরল। এমনকি এর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিস্তার রয়েছে। সবপেয়েছির আসরের শাখা আসর থেকে অঞ্চল ও মূলকেন্দ্র পর্যন্ত আসরের নিজস্ব সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। স.পে.আ-র সদস্য/প্রশিক্ষক তথা স্বেচ্ছাসেবকরা শুধুমাত্র ভালো লাগা ও ভালোবাসার তাগিদে সবপেয়েছির আসর নামক রথের চাকাকে গড়িয়ে নিয়ে চলে।

সংগঠনের নাম থেকে বোঝা যায় স.পে.আ.-র সদস্যরা এখান থেকেই জীবনের সব রসদ পেয়ে যায়। খেলাধূলা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শরীরচর্চা, হাসি, মজা, আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার হল সবপেয়েছির আসর। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মনের আনন্দে খেলাধূলা করা একটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ে পড়াশোনার চাপ, বাড়িতে বিদ্যালয়ের দেওয়া কাজের চাপ, তার সাথে শিক্ষক ও বাবা-মায়ের বকুনিতে বিধ্বস্ত শিশুটি আসর মাঠে খোলা আকাশের নিচে অন্যান্য শিশুর সাথে প্রাণ খুলে, মনের আনন্দে, পরম নিশ্চিন্তে যখন খেলাধূলা করে তখন তার মনটা স্বাভাবিক নিয়মেই নির্মল ও সতেজ হয়ে ওঠে। ফুলের পাপড়ির মতো শিশুদের এই প্রাণখোলা হাসি, নির্মল আনন্দ আর কলরবে প্রতিদিন বিকেলে আসরমাঠ মুখরিত হয়ে ওঠে। প্রশিক্ষকরা সাধারণতঃ সোনারকাঠি ভাইবোনেদের অতিরিক্ত শাসন না করে তাদেরকে ভালোবাসার মাধ্যমেই বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষণ দিয়ে থাকেন। এতে শিশুরা স্বাধীনতা পায় বলে শেখার আগ্রহ বাড়ে আর আসরের প্রতি ভালোবাসা গড়ে ওঠে।

আসর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনটি পর্যায়ে প্রতিটি শাখা আসর পরিচালিত হয়। প্রথম পর্যায় অর্থাৎ আসর শুরু—একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিকেলবেলা আসর মাঠে জমায়েত হওয়া; কর্মী, সত্যসেবীর নির্দেশে ফাইল বা লাইন করে দাঁড়ানো; সোনারকাঠি, কর্মী বা সত্যসেবীর দ্বারা আসর পতাকা উত্তোলন এবং জোড় হাত করে পতাকাকে প্রণাম (শুভম স.পে.আ.) জানিয়ে সমবেত কণ্ঠে পতাকাগীতি গাওয়া—"আমাদের আসর পতাকা / নীল-সাদাতে জমির ওপর জ্ঞানের প্রদীপ আঁকা"। এরপর একসাথে আসর সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করা—"শিক্ষা নেবো সবার ঠাঁই / শক্ত দেহ গড়তে চাই / ছেলে-মেয়ে সব সমান / এই আসরের রাখবো মান / গড়ব সবল স্বেচ্ছাদল / সংগঠনে মাতবি চল / জাতিভেদ আর নাইরে নাই / মানুষ হতে চাই সবাই / সত্যপথে চলবি চল / ঈশের আশিষ মোদের বল।" আসর শুরুর এই যে পদ্ধতি তাতে অতি সু-শৃঙ্খলিত নীতিশিক্ষার এক অঙ্গ। এতে শিশুকাল থেকে তাদের মনে সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা, নিয়মানুবর্তিতা, সর্বোপরি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সত্যকে সামনে রেখে প্রকৃত মানুষ হওয়ার সোপান তৈরি হয়। শৈশব থেকে "স্বেচ্ছাসেবী-সংগঠন" এ কথাগুলির সাথে পরিচয় ঘটছে। তদুপরি সোনারকাঠি "ভাই-বোন" এ শব্দ যুগলের যে মাধুর্য তাতে শৈশব থেকে শিশুরা নিজেদেরকে ছেলে বা মেয়ে না ভেবে ভাই-বোন ভাবতে শিখছে আর একসাথে চলার মন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ শিক্ষণ কর্মসূচি—সবপেয়েছির আসরের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে যেগুলির উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হল :—

(১) ছড়া ও ছড়ার ব্যায়াম : ছন্দোবদ্ধ সুন্দর ছড়া মুখে বলে বলে

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 12

হাত-পা ছুঁড়ে ভঙ্গি করে দেখানো ও ব্যায়াম করার মধ্যে শিশুদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আনন্দ বৃদ্ধি পায়, স্মৃতিশক্তি বাড়ে ও শরীরচর্চা হয়।

(২) সমবেত ও তালি ব্যায়াম : সমবেতভাবে ব্যায়াম করার ফলে শরীরচর্চার পাশাপাশি একসাথে সকল কাজ করার মানসিকতা তৈরি হয়। অন্যদিকে, তালি ব্যায়াম করার সময় শিশু মনে এক অনাবিল আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

(৩) যোগ ব্যায়াম : এর মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক উন্নতির বিকাশ ঘটে।

(৪) খেলা-ধূলা : সবপেয়েছির আসরে শিশুদের উপযোগী খেলাধূলা করানো হয়। এতে শিশুদের শরীর ও মন ভালো থাকে, তাদের উদ্দীপনা বাড়ে। আর সেই সাথে নির্ণয় করা সম্ভব হয়—কোন্ শিশু কোন্ খেলার জন্য বেশি আগ্রহী এবং উপযুক্ত।

(৫) ব্রতচারী : আসরের অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়গুলির একটি হল ব্রতচারী। সাধারণভাবে এর অর্থ নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কঠিন ও সৎ-সংকল্প গ্রহণ করে একাগ্রচিত্তে তা পালন করা। শিশুরা ভবিষ্যতের সু-নাগরিক হওয়ার সার্বিক শিক্ষা এখান থেকে পেয়ে থাকে।

(৬) লোকনৃত্য : শিশুরা বিভিন্ন প্রদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে এক সম্যক ধারণা লোকনৃত্যের মাধ্যমে পেয়ে থাকে। পরবর্তীকালে তাদের "বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য"—এ ধারণা সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(৭) কুচকাওয়াজ : নিয়মিত কুচকাওয়াজ চর্চার ফলে শিশু মনে নিয়ম-কানুন মেনে সমবেত ভাবে কাজ করার দৃঢ় মানসিকতা তৈরি হয়; শৃঙ্খলাবোধ জেগে ওঠে এবং সজাগ ও চটপটে হয়।

(৮) ড্রিল : এর মাধ্যমে শুধু শরীরচর্চাই নয়, উদ্ভাবনী শক্তি ও মানসিক আনন্দ বৃদ্ধি পায়।

(৯) হাতের কাজ : রঙিন কাগজ, কাপড় কেটে ফুল, পাতা তৈরি, আলপনা আঁকা বা রঙ্গোলী তৈরির ফলে সোনারকাঠি ভাই-বোনেরা যেকোন অনুষ্ঠানের পরিবেশকে সুন্দর করে সাজাতে শেখে। ফলে শিশু মনে নিজে কিছু করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

(১০) গান : গান এমন এক শিল্পকলা যা নিয়মিত চর্চা করলে বা শুনলে যেকোন মানুষের মনের প্রসারতা, প্রফুল্লতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। জ্ঞানের প্রসার ঘটে। সবপেয়েছির আসরের গানগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। যেমন— ক) ফুটবো মোরা ফুটবো / এই বিশ্বভুবনে ফুটে উঠবো। খ) বিশ্বের সব শিশুদের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় / চাই বড় হবার সব অধিকার, কেউ যেন বঞ্চিত না হয়। গ) আমরা হলেও ছোট / মোদের নয়কো ছোট মন। ঘ) রামধনু রং দিগন্তে ঐ আসছে নতুন দিন / শান্তি সেনা এগিয়ে চলো সত্য যে সঙ্গীন। ঙ) স.পে.আ. গড়েছি আমরা মিলেছি একসাথে / স.পে.আ.-র পতাকা আমরা তুলেছি এই হাতে।

এসব গানগুলির কথা, ভাব, আবেগ এমনই যা নিয়মিত আসরে একসাথে চর্চার ফলে শিশুমনে "দেশকল্যাণ" ও "জনকল্যাণে"র বীজ দানা বাঁধতে শুরু করে—যা পরবর্তী কালে ব্যক্তি ও ব্যষ্টির কল্যাণই ঘটে।

তৃতীয় পর্যায়— শিক্ষাশ্রেণির শেষে বা খেলাধূলার পর সমবেতভাবে ফাইল / লাইনে পতাকা দন্ডের সামনে দাঁড়িয়ে, শুরু যে করেছিল সেই সোনারকাঠি / কর্মীর আদেশে পতাকাকে প্রণাম জানিয়ে, পতাকা অবনমন করার পর সমবেতভাবে আসর সংগীত গান—"আমাদের আসরের সব শুভ হোক / সবে মিলে গড়ে তুলি মঙ্গললোক। .... /.................... / সবপেয়েছির আসরের আজি জয় হোক।" পরিশেষে, তিন তালি দিয়ে ডান দিকে মোড় নিয়ে আসরের কাজ সমাপ্ত হয়। তাহলে আসর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিশুরা প্রতিটি মুহূর্তে হাসি, মজা, অনাবিল আনন্দই পাচ্ছে তা নয়, সেই সাথে জীবনের রথের চাকাকে সঠিকভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে অনায়াসেই ঠেলে নিয়ে যাওয়া যায় তার ভিত তৈরি হচ্ছে।

সবপেয়েছির আসরের প্রতিদিনের কর্মসূচি ছাড়াও আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি নেওয়া হয়, তা হল—

(১) আসর পত্রিকা প্রকাশ : কিছু কিছু শাখা আসর নিজস্ব পত্রিকা, দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করে যার মাধ্যমে শিশুমনের ভাবনা, আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং লেখার অভ্যাস তৈরি হয়।

(২) পতাকা দিবসে অর্থসংগ্রহ : আসরের এটি বিশেষ কর্মসূচি, পতাকা দিবসে আসরের সোনারকাঠি ভাই-বোনেরা আসরের নির্দিষ্ট পোশাকে সকলের কাছে দল বেঁধে গিয়ে আসর সম্পর্কে বলে এবং অর্থ সংগ্রহ করে। আর সেইসাথে সকলকে পতাকা পরানো হয়। এর ফলে শিশুরা শৈশব থেকেই সকলের সাথে মেলামেশা, কথা বলা এবং অন্যকে বোঝানোর ব্যাপারে পারদর্শী হতে থাকে — যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(৩) পিক্‌নিক : শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা পিকনিক প্রতিটি শাখা আসরের বিশেষ কর্মসূচি। এতে শিশুরা একসাথে আনন্দ করার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করে।

(৪) শিক্ষাশিবির : সবপেয়েছির আসরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হল শিক্ষা শিবির। শিক্ষা-শিবির সাধারণতঃ একদিনের, তিনদিনের (আঞ্চলিক) এবং বার্ষিক পাঁচদিন / সাতদিনের (আন্তর্জাতিক) শিবির অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিশু এবং বিদেশের কিছু শিশু একসাথে কয়েকদিন কাটানোর ফলে পারস্পরিক ভাষা, ভাব, সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটে।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে সবপেয়েছির আসরের শিশু-কিশোর বা সোনারকাঠি ভাই-বোনেরা নিয়মের অনুশাসনে, অথচ প্রাণোচ্ছল পরিবেশে বেড়ে উঠে ভবিষ্যৎ জীবনে চলার যে শিক্ষা পাচ্ছে তা কখনোই একটি পরিবার থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। মনুষ্য জীবনের আসল উদ্দেশ্য সু-নাগরিকে পরিণত হওয়া—সেই শিক্ষাই সবপেয়েছির আসরের শিশু-কিশোররা পেয়ে চলেছে। তাইতো, স.পে.আ-র সোনারকাঠি ভাই-বোনেরা বলতে পারে— "একই মত, একই পথ আমরা বোন-ভাই / হিংসা-দ্বেষ ভুলে আমরা থাকতে সবাই চাই / মিলে-মিশে স্ফূর্তি করে সার্থক হবে মোদের খেলা / সবপেয়েছির আসর সুনাগরিকের মেলা / মানুষ হয়ে উঠবে গড়ে হব না পথ-হারা / সবপেয়েছির আসর আমরা।"

দেশপ্রেমিক, সঙ্গীতপ্রেমিক এবং প্রকৃতিপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র

স্বপন কুমার রায় (সাংস্কৃতিক সচিব)

মহান দেশপ্রেমিক ও ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অনন্য সেনানায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক চিরস্মরণীয় কিংবদন্তী নেতা। তাঁর জন্ম ২৩ শে জানুয়ারি, ১৮৯৭, উড়িষ্যার কটকে। পিতা ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবি শ্রী জানকীনাথ বসু এবং মাতা শ্রীমতি প্রভাবতী দেবী।

ছাত্রজীবন : ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত কটকের র‍্যাভেনশা কলেজিয়েট স্কুল। ১৯১২-১৫ প্রেসিডেন্সি কলেজ। ১৯১৭-১৯১৯ স্কটিশচার্চ কলেজ এবং ১৯১৯-১৯২২ ফোর্ট উইলিয়াম হলে নন-কলেজিয়েট স্টুডেন্ট, ১৯১৯ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯২১ কেমব্রিজ। ১৯১২ সালে ম্যাট্রিকে দ্বিতীয় স্থান এবং কেমব্রিজ থেকে আই.সি.এস. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। আই.সি.এস. পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও বিপ্লব সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইংরেজ সরকারের উচ্চ পদস্থ চাকুরী প্রত্যাখ্যান করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে পরবর্তী অধ্যায়ে সুভাষের ছাত্রজীবন শুরু। স্বদেশবাসী এবং পরাভূত উপনিবেশে মুক্তির আকাঙ্খা তখন থেকেই তাঁর মন ও মনন এবং জীবন চর্চাকে আপ্লুত করে রেখেছিল।

দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র :

১৯১৯ সালে দমনমূলক রাওলাট আইন ভারতীয়দের জাতীয় আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য করে। কেমব্রিজ থেকে ভারতে ফিরে এসে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রচারের দায়িত্বে নিযুক্ত হন এবং স্বরাজ নামক সংবাদপত্রে লেখালেখি শুরু করেন।

সুভাষচন্দ্রের মর্মগুরু রূপে পাই স্বামী বিবেকানন্দকে। সক্রিয় বিপ্লব গুরুরূপে পাই বিপ্লব স্রষ্টা ঋষি অরবিন্দকে এবং কর্ম ও শিক্ষাগুরু রূপে পাই যথাক্রমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও আচার্য বেণীমাধবকে। আই.সি.এস. পদের দুর্জয় লোভ বর্জন করে ভারতবর্ষে ফিরে এসে চলে গেলেন সবরমতী আশ্রমে গান্ধীজীর কাছে। আলাপ-আলোচনায় পরস্পরকে চিনতে পেরেছিলেন। গান্ধীজী তাই সুভাষকে পাঠিয়ে দিলেন দেশবন্ধুর কাছে। শুরু হলো নবীন সুভাষের অনন্য সাধনা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে। কর্মগুরু রূপে কর্মশিষ্য সুভাষচন্দ্রকে স্বস্থানে বসিয়ে যেতে তাঁর কালবিলম্ব হয়নি।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সংগ্রামী পরিমন্ডল গড়ে উঠেছিলো সুভাষচন্দ্র তার সঙ্গে যুক্ত হন এবং এরজন্য পুলিশি নির্যাতন, কারাদন্ড সবকিছুই তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। সাধারণ জনগণ, ছাত্র, যুব, শ্রমিক, কৃষক নিয়ে সমগ্র আন্দোলন দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঝড়ের বেগে ছুটে চললো। উদ্দেশ্য এক হলেও আদর্শের পার্থক্য ছিল গান্ধীজীর সঙ্গে। উভয়ের মধ্যে আদর্শের সংঘাত চলল। এই সংঘাতে আঘাতে উল্কার মত সুভাষের প্রতিভা বিকশিত হতে থাকল। এই সংঘর্ষের কাহিনি ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল। এরই মধ্যে সুভাষচন্দ্র ১৯৩০ থেকে ১৯৩১ কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদে আসীন ছিলেন।

১৯৩৮ সালে হরিপুর কংগ্রেস অধিবেশন, সুভাষ তার নির্বাচিত সভাপতি। সুভাষ তাঁর ভাষণে বললেন, ইউরোপের আসন্ন মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ইংরেজদের মুখাপেক্ষি না হয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হবে। গান্ধীজী এর কঠোর বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে সভাপতি নির্বাচনে সুভাষের কাছে সীতারামাইয়ার পরাজয়ে গান্ধীজী সখেদে বলেছিলেন, "সীতারামাইয়ার পরাজয় আমার পরাজয়।" কালজয়ী দ্রষ্টার দৃষ্টি থেকে রবীন্দ্রনাথ আগামি দিনের সুভাষকে দেখতে পেয়েছিলেন বলে তাঁকে "দেশনেতার" আসনে বরণ করেছিলেন। ১৯৪০ সালে বিহারের রামগড়ে কংগ্রেসের সম্মেলনের পাশাপাশি অনেক বেশি লোক নিয়ে সুভাষচন্দ্র আপোষবিরোধী সম্মেলন পরিচালনা করেন। আপোষ নয়, সংগ্রাম—এই ছিল তাঁর রণধ্বনি। এইজন্য কংগ্রেস সেদিন সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলেও সুভাষচন্দ্রকে স্তব্ধ করতে পারেনি।

হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের একদিন আগে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সি জেলে আটক করে রাখা হয়। পরে শারীরিক কারণে তাঁকে তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে বন্দী করে রাখা হয়। এখান থেকে তিনি আত্মগোপন করে প্রথমে ইউরোপে ও পরে দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে যান। সেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকারকে অবলম্বন করে তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম করেন।

কাব্য, সঙ্গীত এবং প্রকৃতিপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র :

সুভাষচন্দ্র কখনই কবি বা সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন না। কিন্তু কবিতা ও সঙ্গীত তাঁর জীবনে প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল এবং তাঁর জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল।

মান্দালয় কারাগারে অন্তরীণ অবস্থায় সুভাষ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু কবি লেখক ও সঙ্গীতজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপ কুমার রায়কে লেখেন, "বন্ধু, সারাদেশকে সঙ্গীতের বন্যায় প্লাবিত করে দাও। আর যে সহজ আনন্দ আমরা যা হারিয়ে বসেছি তা আবার জীবনে ফিরিয়ে আনো।"

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 14

যার হৃদয়ে আনন্দ নেই সঙ্গীতে যার চিত্ত সাড়া দেয় না, তার পক্ষে মহৎ, বৃহৎ কিছু সম্পাদন করা কি কখনও সম্ভব?

রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র, নজরুল প্রমুখ বাংলার সাহিত্য জগতের দিকপালগণের লেখার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল এবং তিনি তাঁদের প্রত্যেকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্র দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃতিপ্রেম ও দেশপ্রেম পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তাঁর শিক্ষাগুরু বেণীমাধব দাস তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন প্রকৃতির নিত্য পরিবর্তিত রূপের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিতে।

সুভাষচন্দ্রের জীবনে রবীন্দ্রকাব্যের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারি। "তরুণের স্বপ্ন"তে তিনি উদ্ধৃত করেছেন, "ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা"। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শিশির বসুর থেকে জানা যায় সুভাষচন্দ্র রজনীকান্তের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" গানটি বাড়িতে গাইতেন। অতুল প্রসাদের "ওঠো গো ভারতলক্ষ্মী" গানটিও ছিল তাঁর ভীষণ প্রিয়। বিপ্লবী কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান ও কবিতা সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' নাটকে সব্যসাচীর চরিত্র ছিল প্রকৃতপক্ষে সুভাষ চরিত্রের রূপায়ন।

এই মহান দেশপ্রেমিক ও ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অনন্য সেনানায়ক দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর ২০২১ সালে তাঁর জন্মদিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতীয় পরাক্রম দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন। এই বৎসর, ২০২২ এর ২৩শে জানুয়ারি তাঁর ১২৫তম জন্মদিন, তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। **জয়তু নেতাজি।**

ভারতের স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর

অধ্যাপক (ডঃ) ভাস্কর কুমার কয়াড়ী

(উপদেষ্টা বীরভূম অঞ্চল স.পে.আ.)

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।।"

— কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা : স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "যদি এই পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ থাকে, যাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যেতে পারে, যদি এমন কোনও স্থান থাকে,........যেখানে মানুষের ভেতর ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শান্তভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ সবচেয়ে অধিক পরিমাণে হয়েছে, যদি এমন কোনও দেশ থাকে যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হয়েছে, তবে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।" এ কোন কবির কল্পনা নয়। এটি বিশ্বপথিক বীর সন্ন্যাসীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ অভিব্যক্তি।

ভারতবর্ষ এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্যশালী ও সুসভ্য দেশ। এই দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রায় পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন। ভারতের প্রাচুর্য ও সভ্যতায় আকৃষ্ট হয়ে শক, হূণ, পাঠান, মুঘল এবং ইউরোপের বণিকরা বারবার চেষ্টা চালিয়েছে আধিপত্য বিস্তার করে মূল্যবান ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করতে। ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবে বিদেশিরা অনেকক্ষেত্রেই সফল হয়েছে। বিদেশি শাসন ও শোষণে ভারতবর্ষ জর্জরিত হয়েছে। কিন্তু কারও শাসনকালেই ভারতবাসী তাদের আধ্যাত্মিকতা ও জীবনসাধনার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। পৃথিবীর অনেক জাতির চেয়ে বিপুলতর ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েও ভারতবাসী কোনওদিন অর্থের জন্য লালায়িত হয়নি। ভারতবর্ষকে দখল করার জন্য বহুদেশ চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ কখনও অন্যদেশ দখলের চেষ্টা করেনি। এটাই ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব।

ভারতের পরাধীনতার পটভূমি : বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি ভারতবর্ষে বাণিজ্য স্থাপনের মাধ্যমে ধন-সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য পর্যায়ক্রমে এই দেশকে আক্রমণ করেছে এবং অবশেষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমনের পর ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা ভারতকে পরাধীন করে। এ-এক সুদীর্ঘ ইতিহাস।

ভারতে প্রথম ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা কায়েম করে 'ডাচ'-রা ১৬০৫ - ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। পরে 'ভেনিস' ১৬২০-১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ, 'ফরাসি'রা ১৭৬৯-১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দ এবং পর্তুগীজরা ১৫০৫-১৯৬১ পর্যন্ত তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল। ১৬১২ সালে ভারতে আসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এই কোম্পানি ১৬১২-১৭৫৭ সাল পর্যন্ত বাণিজ্য করার পর ভারতে কোম্পানি শাসন চলতে থাকে ১৭৫৭-১৮৫৮ সাল পর্যন্ত। এরপর বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় রাজদণ্ড রূপে। ব্রিটিশরা ১৮৫৮

থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে রাখে। ভারতে ইংরেজ শাসন একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিলীয়মান মুঘল সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল সুবাহ্ বাংলা বা মুঘল বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা) ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়া শুরু হয় সতের শতকের শেষের দিকে। ইংরেজ বণিকরা অন্য ইউরোপীয় বণিকদের তুলনায় এই দেশে শেষে এসেও শক্তি, সামর্থ ও বুদ্ধিবলে ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় ধাপে ধাপে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। ১৬৯৮ সালে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর—এই তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করে ইংরেজ আধিপত্য প্রসারিত হতে থাকে। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ কোম্পানিকে উদ্বুদ্ধ করে প্রকৃত ক্ষমতা দখলের জন্য। দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে মীর কাসিম শেষ চেষ্টা করেছিলেন বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত হতে। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর ১৭৬৫ সালে ইংরেজরা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানী লাভ করে।

সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ ছিল স্বাধীন রাজা-বাদশাদের শাসনাধীন। ইংরেজ শাসন শুরুর পূর্বে ভারতভূমি কখনও পরাধীন ছিল না। ভাস্কো-ডা-গামার ভারত প্রবেশের জলপথ আবিষ্কারের পর যে সমস্ত বিদেশি বণিকরা এদেশে এসেছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। কিন্তু ইংরেজরা একসময় ভারতে আশ্রিত হয়ে প্রবেশ করে গোটা ভারতের প্রভু হয়ে ওঠে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রহসনমূলক যুদ্ধের মাধ্যমে গোটা ভারতবর্ষে নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করে। ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য অস্ত যায়। চলতে থাকে ব্যাপক লুণ্ঠন, শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়ন। ভারতের অর্থনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে তারা সুকৌশলে ধ্বংস করে দেয়। ভারতবাসী ক্রমশঃ নিজের ধর্ম ও আত্মবিশ্বাস ভুলে ব্রিটিশের দাসত্ব করতে থাকে। রাজা, জমিদার ও বিত্তশালীরা ব্রিটিশের তোষামোদ করে ভোগ-বিলাসের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়। আর বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষের অবস্থার ক্রম অবনতি ঘটতে থাকে। তাদের উপর অত্যাচার সীমাহীন হয়ে পড়ে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সুদীর্ঘ। প্রায় ২০০ বছরের ইংরেজ শাসন ও শোষণের যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভের জন্য অখণ্ড ভারত (বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ)-এর জনগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের আন্দোলনে যুক্ত হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

১৮৫৭ সালে 'সিপাহী বিদ্রোহ' ভারতে প্রথম সংগঠিত স্বাধীনতা আন্দোলন। মঙ্গল পান্ডে এই আন্দোলনে প্রধান নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ইংরেজ সরকার কঠোর হাতে দমন করলেও এর মাধ্যমে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়। ১৮৫৮ সালে ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করেন। ধীরে ধীরে আরও অনেক ব্রিটিশ বিরোধি আন্দোলন চলতে থাকে। সাধারণ মানুষেরা এই আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। সারা দেশে বিপ্লবের ঢেউ ওঠে। নীল বিদ্রোহ, ওয়াহাবি আন্দোলন, ফকির বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদি আরও কত প্রাদেশিক আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজদের দুর্বল করার জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে। ১৮৮৫ সালে হিউমের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু সে সময় কেবলমাত্র ইংরেজদের কাছে আবেদন নিবেদন পন্থা (Prayer and Petition Policy)-র মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল।

১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে সাফল্যের পর তিনি ১৮৯৭ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। নবজাগরণের অগ্রদূত স্বামীজী এরপর কলম্বো থেকে আলমোড়া (বর্তমান উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত) পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতার মাধ্যমে আত্মশক্তি বিস্মৃত ও ঘুমন্ত ভারতবাসীর মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন। তিনি বলেন, "সাফল্য লাভ করতে হলে প্রবল অধ্যবসায়, প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই। শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। ওঠো, জাগো, আর ঘুমিও না। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—Arise! Awake! and stop not till the goal is reached—ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না। হে ভাবী দেশপ্রেমিকগণ! তোমরা হৃদয়বান ও প্রেমিক হও। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত একদল যুবক গঠন করো। ভারতমাতা সহস্র যুবক বলি চান। পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। পরোপকারই ধর্ম, বাকি যাগযজ্ঞ সব পাগলামো। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। আগামী পঞ্চাশ বছর পরাধীন ভারতমাতাই তোমাদের উপাস্য দেবী হন। বাকি সব অকেজো দেবতা দূরে থাকুন।" এই সময় স্বামীজীকে ভারতের স্বাধীনতালাভ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন—আমি এখনই স্বাধীনতা এনে দিতে পারি, কিন্তু স্বাধীনতাকে রক্ষা করবে কে? বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ সঙ্ঘবদ্ধ যুবক আবশ্যক। চাই একদল মহান দেশপ্রেমিক। নতুন ভারত গড়ে উঠবে ভারতীয় ভাবধারাতেই। আগামী পঞ্চাশ বছর পর ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে এবং আরও পঞ্চাশ বছর লাগবে ভারতকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে। স্বামীজীর কথা সফল হয়েছে।

স্বামীজীর ভাবধারায় উদ্দীপিত হয়ে অনেক যুবক এগিয়ে আসেন। তাদের কাছে থাকতো স্বামীজীর বাণী ও রচনা এবং শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা—যা তাদের মনে শক্তি সঞ্চার করেছিল। মহামান্য তিলক, লালা লাজপৎ রায়, শ্রী অরবিন্দ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ভাবতে শুরু করেন—আর Prayer and Petition নয়, এবার যথার্থ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের প্রাপ্য অধিকার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হবে।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত জুড়ে "ইংরেজ খেদাও" আন্দোলন তীব্রতর হয়। একদিকে মহাত্মা গান্ধীর "অহিংস আন্দোলন" অপরদিকে নেতাজির "সশস্ত্র আন্দোলন"। তাঁর আহ্বান ছিল—"তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।" দুই ভিন্ন মতকে কেন্দ্র করে গান্ধীজী ও নেতাজির মধ্যে প্রবল মতবিরোধ দেখা দেয়। নেতাজি গোপনে ভারত পরিত্যাগ করে হিটলারের সহযোগিতায় সাবমেরিনে করে জার্মান থেকে জাপানে পৌঁছান। এখানে রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে "আজাদ হিন্দ ফৌজ"-এর দায়িত্ব নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জাপানের সহায়তায় "আজাদ হিন্দ ফৌজ" নিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে আরাকান, ইম্ফল, ময়রাং, বিষেণপুর প্রভৃতি এলাকা সুভাষচন্দ্র দখল করেন। কিন্তু ইংরেজ বাহিনীর কামান, বিমানের আক্রমণের ফলে এবং সেনাবাহিনীর রসদের অভাবের জন্য তাঁদেরকে পিছু হঠতে বাধ্য হতে হয়। এরপর থেকে নেতাজির আর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ইতিপূর্বেই ১৯০৫ সালের ২০ জুলাই বাঙালির জীবনে এসেছে

চরম আঘাত। ঐদিন ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাত দেখিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তিভূমি বাংলাকে বিভাজন করে বাংলার ও বাঙালির শক্তি হ্রাস করেন। এর প্রতিবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ রাখী বন্ধনের মাধ্যমে ১৬ অক্টোবর হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বার্তা দেন। নারী-পুরুষ একযোগে এতে অংশগ্রহণ করেন। বাঙালিরা একদিন অরন্ধনের মাধ্যমে অনাহারে থাকেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রোধ করা সম্ভব হয়নি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলন চালিয়ে যায়। পাশাপাশি নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক আদর্শে তাঁর অনুগামী বীর যুবকেরা সশস্ত্র আন্দোলন চালিয়ে যান। এই যুগ্ম আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা আসে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ব্রিটিশ রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকার বুঝেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রতিহত করার ক্ষমতা তাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। তাই ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে বাধ্য হয়ে ঘোষণা করেন—১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতের শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। এই সময় পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এতটাই বেড়ে যায় যে ব্রিটিশসেনা সেই দাঙ্গা রোধে ব্যর্থ হয়। ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটন ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাত্রে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং পাশাপাশি পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেন মূলত ধর্মের ভিত্তিতে। ভারত স্বাধীনতা লাভ করল দ্বিখণ্ডিত রূপে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু হলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। আর লর্ড মাউন্টব্যাটেন হলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল।

দিল্লির লালকেল্লায় লাহোরি গেটের উপর এইদিন প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী স্বাধীন ভারতের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বলেছিলেন—"সারা বিশ্ব যখন ঘুমাবে, ভারতবর্ষ জেগে উঠবে নিজের মহিমায়।"

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল্যায়ন : ভারতবাসীর কাছে স্বাধীনতা ছিল বহু প্রত্যাশিত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাথে সাথে ভারতবাসীর মনে আশা-আকাঙ্খা ও সমৃদ্ধ ভারত গঠনের পরিকল্পনার জন্ম দেয়। সাফল্য ও ব্যর্থতার কিছু কথা মানুষের মনে উঠে আসে। যথা -

ক) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গোটা দেশবাসী অংশগ্রহণ করেছেন বলে স্বীকার করা হয়। তবে এই সংগ্রামে বাংলা ও বাঙালির অবদান অপরিসীম। বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র ছাড়া অন্যত্র স্বাধীনতা আন্দোলন সেভাবে দানা বাঁধতে পারেনি। নরমপন্থী আন্দোলনে মূলত যুক্ত হয়েছিলেন হিন্দি ভাষী ও গুজরাটীরা। আর চরমপন্থী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন বাংলার মানুষ। এই চরমপন্থী বাঙালিদের কাঁধে বন্দুক রেখে নরমপন্থীরা ইংরেজ প্রভুদের সামনে নিজেদের ভাল মানুষের পরিচয় রেখেছেন। চরমপন্থী বাঙালিরা দলে দলে কারাবরণ করেছেন ও প্রাণ দিয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে দুই পন্থীদের আচরণে এই মৌলিক পার্থক্য ধরা পড়ে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর রাষ্ট্র পরিচালনায় ও কেন্দ্রীয় স্তরের রাজনীতির মূলস্রোতে বাঙালি ব্রাত্য থেকে গেছে যেটি অপ্রিয় সত্য।

খ) ভারতের স্বাধীনতা লাভ মনে হয় যেন একটি চুক্তি মাফিক বন্দোবস্ত। কারণ স্বাধীনতা ঘোষণার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অখণ্ড ভারতকে ব্রিটিশরা ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত করে ভারত ও পাকিস্তান দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম দিলেন—যা ধর্মনিরপেক্ষতার বুকে কুঠারাঘাত। এরকম স্বাধীনতা কাঙ্খিত ছিল না। এই ধর্মীয় বিভাজনের মাসুল সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত দুই রাষ্ট্র, বর্তমানে বাংলাদেশসহ তিন রাষ্ট্রের মানুষকে বহন করতে হচ্ছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হাজার হাজার হিন্দুর মৃত্যু হয়েছে অথবা দলে দলে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। ফলে ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে। ব্রিটিশের এই Divide and Rule Policy সেই সময় স্বাধীনতার কাণ্ডারীরা মেনে নিয়েছিলেন। এটি গভীর বেদনাদায়ক।

গ) ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলেও ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারত একটি প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই মধ্যবর্তী দুই বছর পাঁচমাস সময়কাল ভারত ব্রিটিশের স্বায়ত্বশাসনে ছিল। এ যেন স্বাধীনতা পেয়েও পরাধীনতার নামান্তর।

ঘ) ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়। ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর ছিলেন এই সংবিধান রচনার প্রধান স্থপতি। এই সংবিধান ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রক্ষাকবচ তথা সর্বোচ্চ দলিল। এতে সরকারের গঠন, কার্যপদ্ধতি, নাগরিকের ক্ষমতা, অধিকার ও কর্তব্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সংবিধানের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ আজও বঞ্চিত। "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"

ঙ) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পৃথিবীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভারতবর্ষ স্বাধীন না হলে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতাম না।

চ) বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এই ভারত উপমহাদেশের মহত্ব প্রকাশের এক মহান নিদর্শন। সারা পৃথিবীতে গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপে ভারত তার মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠা করেছে।

ছ) স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর সময় বড় কম নয়। ভারতবর্ষ আরও সমৃদ্ধশালী দেশ হতে পারত। কিন্তু যথার্থ শিক্ষার অভাবে তা সম্ভব হয়নি। ব্যর্থতা থেকেই আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। তবে দেশ-বিদেশে ভারতের সাফল্যের খতিয়ানও কম নয়, যার তথ্য অনুসন্ধান করলে আমরা সকলেই জানতে পারি।

উপসংহার : ভারতের স্বাধীনতা লাভের পঁচাত্তর বছর পূর্তিতে আমরা ভারতবাসী হিসাবে অবশ্যই গর্বিত। এই গৌরব জনগণের, গণতন্ত্রের, প্রজাতন্ত্রের এবং অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষতার। স্বাধীনতার দিশারি স্বামী বিবেকানন্দের ১৬০তম পুণ্য জন্মদিন ১২ জানুয়ারি ২০২২ সারা ভারতে "আজাদী কা অমৃত মহোৎসব-এর শুভ সূচনা মহাত্মা গান্ধীর সবরমতী আশ্রম থেকে করেছেন ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই উৎসব সম্পূর্ণ হবে এই বছর স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যদিনে। আমরা প্রণাম জানাই দেশমাতৃকাকে ও তাঁর সংগ্রামী বীরসন্তানদের চরণে।

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 17

সত্যি ভূতের গল্প

গোপাল আইচ

(উপদেষ্টা, স.পে.আ.)

মাসটা আগস্ট, শনিবার, অমাবস্যা, বাটানগরে ৩ দিনের শিবির। আমি শুক্রবার আসতে পারিনি। শনিবার সন্ধ্যায় শিবিরে উপস্থিত হলাম। রাতের আহার শেষ হলে শোবার পালা। বিকেলে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, বেশ ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। যে যার আগের দিনের মতো বাইরে থাকা বেঞ্চগুলো সাজিয়ে শোবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। আমার শোবার মতো কোনো বেঞ্চ না থাকায় যে বেঞ্চগুলির ওপর খাবার পরিবেশিত হয়েছে সেই বেঞ্চ তিনটি জোড়া দিয়ে শোবার ব্যবস্থা করলাম। বেঞ্চের ওপর ভাত-ডাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে একটা কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে তার ওপর শোবার ব্যবস্থা করে নিলাম। আমার সাথে চুণী (মৃণাল ব্যানার্জী) শোবার জন্য জুটে গেল। আমাদের ডানদিকের বেঞ্চে শুয়ে আছে অপুদা (অপূর্ব গাঙ্গুলী) ও কবিদা (জয়ন্ত দেশমুখ) আর বাঁদিকে শুয়ে আছে মিহির (মিহির মুখার্জী)। সেদিন বাটানগরে সিনেমা হলের কাছে বিকেলে একটা মার্ডার হয়েছে। যার ফলে চারিদিকে থমথমে, বেশ গা-ছম্‌ছম্‌ ভাব। রাতের সেন্ট্রিরা এসে বলল, অপুদা, আপনারা তো বাইরে শুয়েছেন, এখানেও একজন সেন্ট্রি দিয়ে দিই। অপুদা গম্ভীর হয়ে স্বভাবসিদ্ধভাবে বলল, না, না আমাদের এখানে সেন্ট্রির প্রয়োজন নেই। আমরা কি কিছু কম আছি? কিছুক্ষণের মধ্যেই অপুদার নাসিকাগর্জন শুনতে পেলাম।

বিপত্তিটা ঘটলো রাত বাড়র পর। চুণী ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। আমিও ঘুমের মধ্যেই ওকে ছাড়াবার চেষ্টা যতই করলাম ও ডান পা দিয়ে আমাকে চেপে ধরে এক বিকট চিৎকার করে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে লাগলো। আমিও স্বপ্নের মাঝে ভাবলাম আমাকে কেউ মারতে এসেছে। আমার মুখ দিয়েও বাঁ...বাঁ একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। দুজনে প্রায় অর্দ্ধেক বসা অর্দ্ধেক শোয়া অবস্থায় ঐভাবে আওয়াজ করে চলেছি। ঐ আওয়াজে ও আমাদের অবস্থা দেখে অপুদা ও কবিদা ভয়ে আমাদের বেঞ্চের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে কাদায়-জলে লুটোপুটি খাচ্ছে। ইতিমধ্যে মিহিরও ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে ওঠে। ভাবছে বুঝি একটা মার্ডারের দৃশ্য। ততক্ষণে সনৎদাও চিৎকার করে এসে দাঁড়ালো। এদিকে সেন্ট্রির বিপদ বাঁশির আওয়াজে কয়েকজন ছুটে আসতে গিয়ে পায়ে দারুণ চোট পেলো। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত ঘটনাটা ঘটলো। শিবিরের প্রায় সবাই জেগে উঠলো। আমার ঘুম ভেঙে গেছে কিন্তু চুপ করে ঘুমের ভান করে শুয়ে রইলাম। কারণ এরমধ্যে সকলের নানা বক্তব্য শুরু হয়ে গেছে। শিবিরে রাত্রে আমি এরকম নানা ঘটনা পূর্বেও ঘটিয়েছি কাউকে না কাউকে ভয় দেখাতে। তাই সকলে ভাবলো আমি বুঝি ইচ্ছে করে এমন ঘটনা ঘটিয়েছি। সুতরাং চুপ করে শুয়ে থাকাটা সমীচিন বলে মনে করলাম। পরদিন সারাবেলা চললো এই আলোচনা। মিহির বলেছিল ভয়ে আমার গেঞ্জিটা ভিজে গিয়েছিল। সকলে ব্যাপারটা সহজভাবে নিলেও আমার সন্দেহ গেলো না। একই সঙ্গে সকলের স্বপ্নে উঠে পড়া এটা কি নিছক সাধারণ ব্যাপার! আসলে তা নয়, ঐ অপরিষ্কার বেঞ্চে রাত্রে শুয়ে পড়া উচিত হয়নি। তার ওপর ঐ মার্ডারটা আমাদের মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল তার ফলেই ঐ ঘটনা। রাত্রে ঘুমের মধ্যে চিৎকার করা, কথা বলা অভ্যেস অনেকেরই আছে। সুতরাং রাত্রে শোবার সময় হাত-পা ধুয়ে মুখে ঘাড়ে জল দিয়ে পরিষ্কার বস্ত্রে ভাল কথা চিন্তা করতে করতে শোওয়া উচিত। না হলে সকলেরই হতে পারে এমন অবস্থা। কিন্তু তাহলে ভূতের গল্পটা কি হলো? তারই একটা ঘটনা বলি—

আমার বাড়ির পাশে এক দম্পতি থাকতো। আমাদের সাথে ভালই সদ্ভাব ছিল। প্রায়ই কথা হতো। হঠাৎ মহিলাটি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। সারা শরীর ফুলে গেল। কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর আর তাঁকে বাঁচানো গেল না। এক সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়। আমার কর্মস্থান ছিল কোন্নগর। আমি সাধারণত বেশিরভাগই রাত্রে duty করতাম। কারণ সারাদিন হুগলি জেলার বিভিন্ন আসর ঘুরে বেড়িয়ে রাত্রে duty করাই অভ্যেস ছিল। আমি ছিলাম ঐ ফ্যাক্টরীর মেডিক্যাল ভারপ্রাপ্ত। মোটামুটি ১১-১২টা অবধি জেগে থেকে শুয়ে পড়তাম। রাত্রে কাজে এসেছি। সেদিনও ছিল শনিবার, অমাবস্যা। সন্ধ্যা থেকে মেঘ যেন ভেঙে পড়েছে। ১২টার সময় শুয়ে পড়ি। মনের মধ্যে ঐ মহিলাটির শ্যামবর্ণা সুশ্রী মুখটা বারবার ভেসে উঠছে। আমার চেম্বারটির ছিল তিনদিক কাঁচের দেওয়াল। বিদ্যুতের আলোর ঝলক মাঝেমাঝেই ঘরটা আলোকিত করছিল। শুরু হল হাওয়া ও বৃষ্টির ঝাপ্‌টা। আমার দরজার বাইরে দারোয়ান বাহাদুর পাহারা দিচ্ছিল। নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি হঠাৎ ঝড়ের দাপটে কাঁচের জানলাটা খুলে যায়। আমি ধরফড় করে উঠে বসে দেখলাম জানলার ওপাশে বাহাদুর ১টা সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ওর কালো চেহারায় সাদা দাঁতগুলো কি করছে! তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দেখেই বুকটা ধড়াস্‌ করে উঠলো। বাহাদুর তো দরজার সামনেই ঘুমোচ্ছে। এক মুহূর্তে আমি ভয়ে ঐ ঠান্ডাতেও ঘেমে গেলাম। ঘড়িতে তখন ১টার ঘন্টা পড়লো। পরদিন জানতে পারি ঠিক ঐ ১টার সময়ই মহিলাটিকে দাহ করা হয়েছিল। তবে কি সত্যিই ঐ মহিলা আমায় সেদিন দেখা দিয়েছিল?

আসলে আত্মা অবিনশ্বর। মৃত্যু মানে শুধু দেহ ত্যাগ। আমরা আমাদের অবচেতন মনে তাদের চিন্তা করলে চোখের সামনে তার অবয়ব ভেসে ওঠে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও আত্মায় বিশ্বাস ছিল বলে প্ল্যানচেটের মাধ্যমে আত্মাদের অনুভব করতেন। সুতরাং ভূতকে নয়, আত্মাকে অনুভব করতে হবে।

আমার এই লেখার একটি চরিত্রে মিহির রয়েছে, আর একটিতে কবিদা (জয়ন্ত দেশমুখ)। কবিদা অনেক আগেই আমাদের ছেড়ে অমৃতনলোকে যাত্রা করেছেন। যখন লেখাটা শেষ করি তখনও মিহির আমাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু বর্তমানে মিহির (মিহির মুখোপাধ্যায়) চিরশান্তির দেশে চলে গেছে। আমার সোনারকাঠি সময়ের বন্ধু, মনে পড়ছে সেই দিনগুলি, একজন প্রতিভাবান শিশুনাটিকা রচয়িতা ও পরিচালক। বহু কাজে ওর সাথি ছিলাম, যার শুরু হয়েছিল স.পে.আ.-র সান্ধ্য মজলিশ থেকে। ভারাক্রান্ত মনে সব কষ্ট বুকে রেখে লেখা শেষ করলাম। ওঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 18

জাতীয় পতাকা

সনৎ ভট্টাচার্য

প্রত্যেক সার্বভৌম রাষ্ট্রের নিজস্ব জাতীয় পতাকা আছে। জাতীয় পতাকার আকার, চিত্র ও রং দেখে সেই পতাকাটি কোন দেশের তা জানা সম্ভব। অথচ অতীতকালে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। পতাকার আবির্ভাব ও প্রচলন হয় মানুষের প্রয়োজনে। প্রাচীনকালে মানুষ সমুদ্রাভিযানে বেরিয়ে সমুদ্রপথে নিজ জাতি বা দেশের পরিচয় দেখানোর তাগিদে বিভিন্ন পতাকা উত্তরোত্তর দেখা যেতে থাকে। এই সূত্রেই ক্রমশঃ এক জাহাজের সঙ্গে আর এক জাহাজের যোগাযোগ সৃষ্টির কাজে পতাকার ব্যবহার হতে থাকে এবং তা থেকেই আসে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। দুই হাতে দুটি পতাকা বিশেষভাবে রেখে সাংকেতিক বার্তা পাঠানোর পদ্ধতিকে বলা হয় ‘সেমাফোর’।

যুদ্ধের নিশান বা সংকেত পাঠানোর জন্য ব্যবহৃত পতাকা থেকেই ডেনমার্ক বা সুইজারল্যান্ডের মতো দেশে প্রথমদিকের জাতীয় পতাকাগুলির উদ্ভব ঘটে। এখন প্রত্যেকটি দেশের জাতীয় পতাকা আছে। তবে আগে প্রতীক হিসাবে কখনও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কখনও বা নিজেকে চিনিয়ে দেবার উপায় হিসেবে। আবার অন্য নানাভাবে পতাকার ব্যবহার হয়ে থাকে। চলন্ত ট্রেনকে সংকেত দেওয়ার জন্য আজও পতাকা দেখানো হয়। অনেক খেলায় পতাকার ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রমবিবর্তনে আমাদের জাতীয় পতাকা তিন রংয়ের। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ তেরঙা পতাকা ফ্রান্সের নীল-সাদা-লাল, ফরাসি বিপ্লবের সময় উদ্ভব হয়। তবে বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বেশি পরিচিত হল ব্রিটেনের উনিয়ন জ্যাক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টারস এ্যান্ড স্ট্রাইপস্।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় জাতীয়বাদী আন্দোলনের প্রভাবে ভারতীয় পতাকার নতুন নক্শা দেখা দেয়। একেবারে গোড়ার দিকে একটি নক্শায় ছিল তিন রং—সবুজ, হলুদ এবং লাল, মাঝে হলুদ জমিতে ‘বন্দেমাতরম্’ লেখা। ভগিনী নিবেদিতা, এ্যানি বেসান্ত ও বালগঙ্গাধর তিলকের মতো বিশিষ্ট মানুষরা পতাকার নক্শা তৈরি করিয়েছিলেন। এরপর গান্ধিজীর অনুগামী পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়া গান্ধিজির পরামর্শ মত প্রথম মাঝখানে চরকা সহ তেরঙা পতাকা তৈরি করেন। ১৯৩১ সালে এই পতাকাকে দেশের জাতীয় পতাকা হিসাবে গ্রহণ করে কংগ্রেস। এই পতাকাটিই ১৯৪৭ সালে ২২ জুলাই ভারতের গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের জাতীয় হিসেবে গ্রহণ করে। কেবল মাঝখানে চরকার বদলে স্থান পায় সম্রাট অশোকের ধর্মচক্র। জাতীয় পতাকা বিষয়ে কিছু নিয়মবিধি লিপিবদ্ধ হয় এর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য। ২০০২ সালে ভারতের জাতীয় পতাকার বিধিনিয়ম সংশোধিত হয় এবং নাগরিকেরা যে কোনদিন নিজের বাড়িতে, অফিসে, কারখানায় ওই বিধির শর্তাবলি মেনে এবং জাতীয় পতাকার কোন অসম্মান না করে জাতীয় পতাকা তোলার অধিকার পায়। এর আগে কেবল বিশেষভাবে নির্দিষ্ট দিনেই যথা ১৫ আগষ্ট, ২৬ জানুয়ারিতে সে অধিকার তাদের ছিল।

১। সংশোধিত পতাকা তোলার নিয়মবিধির যে কোন আবহাওয়ায় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি জাতীয় পতাকা তুলে রাখা যাবে। কিন্তু পতাকাকে পোশাক, পর্দা ইত্যাদি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না এবং তা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

২। জাতীয় পতাকা যেন কখনও মাটি না ছোঁয় বা জলের মধ্যে পড়ে। কোন ধরণের গাড়ির আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না।

৩। অন্য কোন পতাকাকে জাতীয় পতাকার চেয়ে বেশি উঁচুতে তুলে রাখা যাবে না।

৪। জাতীয় পতাকার উপর ফুলমালা বা অন্য কোন বস্তু রাখা অনুচিত।

৫। জাতীয় পতাকা সহ অন্য সঙ্ঘ পতাকা উত্তোলনকালে প্রথমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে পরে সঙ্ঘ পতাকা উত্তোলন করতে হবে, অন্য দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে শেষে জাতীয় পতাকা অবনমন হবে। জাতীয় পতাকা তোলার সময় তেরঙার গেরুয়া রংটি উপরে থাকবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য— আসরপতাকা সূর্যাস্তের পরও অনুষ্ঠানের স্বার্থে তুলে রাখা যাবে তবে পতাকা দন্ডের কাছে যথেষ্ট আলোর ব্যবস্থা থাকা চাই। এছাড়া আসর পতাকার সম্মান বিধি জাতীয় পতাকার মতই হবে।।

❒ সদ্যপ্রয়াত সনৎ ভট্টাচার্য সবপেয়েছির আসরের প্রাণপুরুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন সংগঠনের অন্যতম সহঃসভাপতি। সবপেয়েছির সংগঠনে উৎসর্গীত প্রাণ এই মানুষটির **‘অষ্টআশি বছর বয়সে লেখাটির’** পুনর্মুদ্রণ করা হল।

আশিস যাঁদের সহায় মোদের

অজিত বসু

গত অর্ধশতাব্দী ধরেই সবপেয়েছির আসর বহু জ্ঞানী গুণী মানুষের আশীর্বাদধন্য হয়েছে। আসরের আনন্দ-অঙ্গনে এসে আপ্লুত ও আনন্দিত অসংখ্য স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। অতীতের নানা জনের নানা মন্তব্য থেকে কিছু মন্তব্য সংকলন করেছেন লেখক।

Read the stories of the great achievements of human race whenever they may be found. Though there is slight difference which divided man from man we are the children of the same Supreme. We are hewn from the same rock. We spring from the same source. We may be truly great only when we realise this and not when we fight one another.

Dr. S. Radhakrishnan, *President*, India.

Teach your members the lesson of courage and high standard of personal integrity. These qualities will lead them to the goal you have set for yourselves. Greetings.

Aruna Asaf Ali.

May God bless you and all good fortune even attend you.

Dr. Kailash Nath Katju, *Governor*, W.B.

I am glad to learn of the eleventh Annual Conference and exhibition of the Sab Payechir Asar that will be held on December this year and of the Publication of a special Souvenir Number As one who is deeply interested in the progress and welfare of children, any activity that helps to focus Public attention on the needs of children is most welcome. I wish the conference and exhibition the fullest success.

Hannah Sen. *Hony. Genl. Secy.*,
Indian Council of Child Welfare.

সব পাবে এই আশা করে আমি সবপেয়েছির আসরকে আমার আশীর্বাদ জানাই।

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। *মুখ্যমন্ত্রী*, পশ্চিমবঙ্গ।

সংগঠনী পত্রিকা আমাদের কিশোর কিশোরীদের কেবলমাত্র আনন্দ দেয় না, তাহাদের শিক্ষাদান ও চরিত্র গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। স্বাধীন ভারতে এরূপ প্রয়োজন আছে। আমি আন্তরিকভাবে সংগঠনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। *রাজ্যপাল*, প. ব.

আজকাল যারা শিশু অতি সন্নিকট ভবিষ্যতের তারা মানুষ উত্তরকালের সুধী-কিশোর সমাজের কাছে আমরা বিপুল সম্ভাবনার প্রত্যাশী, তাদের জাগরণ পরিপূর্ণ হোক, আপন আপন শক্তিতে তারা প্রতিষ্ঠিত হোক। সবপেয়েছির আসরের ক্ষেত্র বহু বিস্তৃত হোক এই কামনা করি।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আমাদের ছেলেবেলায় যদি এই জাতীয় সংঘ থাকতো, তবে সাহিত্যে আমি যা দান করেছি, তার চাইতে অনেক কিছু বেশি দিতে পারতাম।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *কথা সাহিত্যিক*।

আপনাদের এই ব্রত কল্যাণের, আপনাদের এই শুভ প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক— এই কামনা করি।

ক্ষিতিমোহন সেন, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী।

আমি যদি শিশু হতাম ত' কামনা করতাম এই স্বপনবুড়ো যদি আমার বড় ভাই হত।

মন্মথ রায়, *নাট্যকার*।

সবপেয়েছির আসরের সঙ্গে অন্তরের পূর্ণ যোগাযোগ হয়ে আমি কামনা করি আসরের সোনারকাঠিরা আরও উন্নত হোক, আরও বড় হোক।

পঙ্কজকুমার মল্লিক, *সঙ্গীত শিল্পী*।

স্বপনবুড়ো পরিকল্পিত 'সবপেয়েছির আসর' যেন স্বপ্নলোক হতে বাস্তব রাজ্যে এসে সত্য বস্তু হয়ে উঠতে পারে, আমি সর্বান্তকরণে এই কামনা করি।

নরেন্দ্র দেব, *কবি*।

সবপেয়েছির আসরের ছোট ভাইবোনেরা হবে আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ সমাজের স্রষ্ঠা। তাদের আভায় হেসে উঠুক সৃষ্টির নব পূর্ণিমা, গড়ে উঠুক ভারতবর্ষে এক শোষণহীন সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা।

বিপ্লবী লোকনাথ বল, *চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন*।

সবপেয়েছির আসরের বার্ষিক সম্মেলনের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

সুখলতা রাও।

আপনাদের সবপেয়েছির আসর সব দিক দিয়ে সুসম্পন্ন হোক—এই ইচ্ছা জানাচ্ছি।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, *পরিসংখ্যানবিদ*।

আপনাদের বার্ষিক উৎসব সর্বতোভাবে সফল হউক ও দেশের ছোট ছেলেমেয়েদের আপনি জ্ঞান ও আনন্দ বর্ধন করিতে থাকুন বহু বৎসর, আমার এই আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

সত্যেন বোস, *বিজ্ঞানী*।

জীবনের যে কোন আঘাত, যে কোন বিপদ জয় করবার জন্য ছেলেমেয়েরা এখন থেকেই প্রস্তুত হয়ে ওঠো।

হেমন্তকুমার বসু, *জননেতা*।

সম্পূর্ণ সহানুভূতি কিশোর বন্ধুদের প্রতি সব সময় থাকবে।

ইন্দিরা দেবী, *শিশুমহল* (আকাশবাণী)।

সবপেয়েছির আসর জোড়া
সোনারকাঠির দল,
রূপেগুণে সোনার মত
হওনা সমুজ্জ্বল;
সোনারকাঠি তোমরা তো
কল্পলোকের ভোমরা তো,
ছন্দে সুরে হওনা সবাই
আনন্দ চঞ্চল।
দেশের হিতে দশের প্রীতে
সবাই লাগো ভরাও পীতে
তবে হবে জীবন সবার
ধন্য অবিকল
সোনারকাঠির দল।

সুনির্মল বসু, *কবি*।

সবপেয়েছির আসরের সাহিত্যসভায় যোগ দিয়ে ভারি খুশি হয়েছি। বাংলা সাহিত্যের ভাবী লেখক লেখিকারা যে অঙ্কুর এখানে দেখতে পেলাম, তা আগামী দিনে পরিপূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠুক, আন্তরিকভাবে এই কামনা জানাই।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সবপেয়েছির আসরে শিশু সংগঠনমূলক কার্যক্রম বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। জানুয়ারি মাসে আসরের ১৪তম বার্ষিক সম্মেলন ও এই উপলক্ষ্যে একটি শিশুচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে। আমি আসরের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

ডাঃ ত্রিগুণা সেন।

সবপেয়েছির আসর আজ যে আয়োজন করেছে, তা শুধু অভিনব নয়, অভূতপূর্ব।

শচীন সেনগুপ্ত, *নাট্যকার*।

তোমার মাঝে যে ধন আছে
তুচ্ছ তাহা নয়
মৃগমদের সুবাস সম
হোক তা ভারতময়।
স্বপ্নে আছে তোমার ভুবন
সত্যে নেই তার লেশ।
হউক আবার স্বাধীন ভারত
সবপেয়েছির দেশ—

কবিশেখর কালিদাস রায়।

স্কুলঘরের বাইরে যে বিচিত্র শিশুজগৎ রয়েছে তারই সন্ধান 'সবপেয়েছির আসর' আমাদের দেশের শিশুদের দিয়েছে। তাই আজ কিশোর শিশুরা এই আসরে সাগ্রহে জড়ো হয়েছে। আজকের এই সবপেয়েছির আসরে বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়ে একত্র হয়ে তাদের জয়যাত্রার পথে এগিয় চলুক, এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

সুধীরচন্দ্র সরকার, *সম্পাদক*, মৌচাক।

'সবপেয়েছির আসর' দশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছেলেমেয়েদের সব কিছু পাইয়ে দেবার ব্রত গ্রহণ করেছে। আশা করি তাদের ব্রত সার্থক হবে।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন, *মন্ত্রী*, *পরে মুখ্যমন্ত্রী*, পঃ বঙ্গ সরকার।

সবপেয়েছির আসর দেখে মনে হল সবই তোমরা পেয়েছো। তবে এমনি করে দেশের জন্য আবার কিছু দিতেও শিখো, তবে তোমাদের পাওয়া সার্থক হবে।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী*।

যে মহাদেশ এশিয়া শুধু আমাদের নয়, প্রায় অধিকাংশ সভ্য জাতির জননী, তার কোলে সবাইকে আহ্বান করে বাংলার তরুণতরুণীরা এক যুগান্তর সূচনা করেছে। ভারতবাসী আমরা যেন চিন্তায় ও সাধনায় প্রমাণ করতে পারি যে, সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতা শুধু কয়েকটা তথাকথিত বড় জাতের জন্য নয়, সর্বমানবেরই চিরন্তন অধিকার—বন্দেমাতরম্।

ড. কালিদাস নাগ।

এই আসরের সফলতা কামনা করি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(পুনর্মুদ্রণ)

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 21

বার্ষিক শিক্ষা শিবির কবে, কোথায়

১৯৪৮	ঘাটশিলা / ঝাড়খণ্ড	১৯৭৫	কোচবিহার/কোচবিহার	১৯৯৮	অশোকনগর/উঃ২৪পরগণা
১৯৫৫	দেওঘর / বিহার	১৯৭৬	নলহাটী/বীরভূম	১৯৯৯	দত্তপুলিয়া/নদীয়া
১৯৫৬	মুর্শিদাবাদ/মুর্শিদাবাদ	১৯৭৭	আলিপুরদুয়ার/জলপাইগুড়ি	২০০০	দক্ষিণ রসুলপুর/হুগলী
১৯৫৭	কার্মাটার/বিহার	১৯৭৮	কাঁথি/মেদিনীপুর	২০০১	আসানসোল/বর্ধমান
১৯৫৮	রাঁচী/ঝাড়খণ্ড	১৯৭৯	শিলিগুড়ি/দার্জিলিং	২০০২	নবব্যারাকপুর/উঃ২৪পরগণা
১৯৫৯	মধুপুর/বিহার	১৯৮০	মুরাড়ি/পুরুলিয়া	২০০৩	মালদা/মালদহ
১৯৬০	ভুবনেশ্বর/ওড়িশা	১৯৮১	আহমেদপুর/বীরভূম	২০০৪	বড়জোড়া/বাঁকুড়া
১৯৬১	বালেশ্বর/ওড়িশা	১৯৮২	বার্ণপুর/বর্ধমান	২০০৬	দুর্গাপুর/বর্ধমান
১৯৬২	রাউরকেল্লা/ওড়িশা	১৯৮৩	বসিরহাট/উঃ২৪পরগণা	২০০৭	শ্রীরামপুর/হুগলী
১৯৬৩	ঝাড়গ্রাম/পঃমেদিনীপুর	১৯৮৪	হুগলীঘাট/হুগলী	২০০৮	মেদিনীপুর/মেদিনীপুর
১৯৬৪	সিউড়ি/বীরভূম	১৯৮৫	সিউড়ি/বীরভূম	২০১০	চাকদহ/নদীয়া
১৯৬৫	বিষ্ণুপুর/বাঁকুড়া	১৯৮৬	মালদহ/মালদহ	২০১১	আসানসোল/বর্ধমান
১৯৬৬	চিত্তরঞ্জন/বর্ধমান	১৯৮৭	টাটানগর/বিহার	২০১২	রাণাঘাট/নদীয়া
১৯৬৭	ভুবনেশ্বর/ওড়িশা	১৯৮৮	খড়্গপুর/মেদিনীপুর	২০১৩	বনপাস/বর্ধমান
১৯৬৮	বার্ণপুর/বর্ধমান	১৯৮৯	দুর্গাপুর/বর্ধমান	২০১৪	শিবপুর বি ই কলেজ/হাওড়া
১৯৬৯	বহরমপুর/মুর্শিদাবাদ	১৯৯০	সাঁইথিয়া / বীরভূম	২০১৫	আহমেদপুর/বীরভূম
১৯৭০	হরিশ্চন্দ্রপুর/মালদহ	১৯৯১	আসানসোল/বর্ধমান	২০১৬	বড়জোড়া/বাঁকুড়া
১৯৭১	বারাণসী/উঃপ্রদেশ	১৯৯৩	বেহালা/কলকাতা	২০১৭	আসানসোল/পশ্চিম বর্ধমান
১৯৭২	দিল্লি / দিল্লি	১৯৯৪	বারাসাত/উঃ ২৪ পরগণা	২০১৮	বহরমপুর/মুর্শিদাবাদ
১৯৭৩	রায়গঞ্জ / পঃদিনাজপুর	১৯৯৬	বহরমপুর/মুর্শিদাবাদ	২০১৯	রাণীগঞ্জ/পশ্চিম বর্ধমান
১৯৭৪	মাইথন/বিহার	১৯৯৭	আহমেদপুর/বীরভূম		

* ১৯৯২ সালে দেশে অস্বাভাবিক অবস্থা, ১৯৯৫ সালে সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্তি উৎসবের জন্য, ২০০৫ সালে হীরক জয়ন্তী পূর্তি উৎসবের জন্য ২০০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবর্ষ পরিবর্তনের জন্য, ২০২০ এবং ২০২১ সালে করোনা অতিমারীর জন্য শিবির হয়নি।

কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির (দ্বিবার্ষিক)

১৯৭২ দুর্গাপুর/বর্ধমান
১৯৭৩ মেদিনীপুর/মেদিনীপুর
১৯৭৪ পুরুলিয়া/পুরুলিয়া
১৯৭৫ আসানসোল/বর্ধমান
১৯৭৬ আরামবাগ/হুগলী
১৯৭৭ কৃষ্ণনগর/নদীয়া
১৯৭৮ দুর্গাপুর/বর্ধমান

১৯৭৯ সারাঙ্গাবাদ/দঃ২৪পরগণা
১৯৮১ বাঁকুড়া/বাঁকুড়া
১৯৮২ বহরমপুর/মুর্শিদাবাদ
১৯৮৩ লাভপুর/বীরভূম
১৯৮৫ শক্তিনগর/নদীয়া
১৯৮৭ বর্ধমান/বর্ধমান
১৯৮৯ চাকদহ/নদীয়া

১৯৯৩ লিলুয়া/হাওড়া
১৯৯৫ তাহেরপুর/নদীয়া
১৯৯৭ তেহট্ট/নদীয়া
১৯৯৯ হরিশচন্দ্রপুর/মালদহ
২০০১ মেদিনীপুর/মেদিনীপুর

সাংগঠনিক কারণে কর্মী শিবিরের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েছে।

২০১৩ ইলছোবা/হুগলী

যাঁরা আজীবন সদস্যপদ অর্জন করেছেন

১. ৺অজিত বসু
২. অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়
৩. ৺অশেষ রায়
৪. বিকাশ প্রামানিক
৫. দিলীপকুমার শেঠ
৬. গণেশ ঘোষ
৭. নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য
৮. প্রণব রায়
৯. পতিতপাবন দাস
১০. ড. রমেশচন্দ্র বসু
১১. রেখা বসাক
১২. প্রভাস রায়
১৩. তপন গুপ্ত
১৪. দিলীপ চক্রবর্তী
১৫. অপূর্ব গাঙ্গুলি
১৬. ৺সনৎ ভট্টাচার্য
১৭. ৺ব্যোমকেশ ঘোষ
১৮. প্রদীপ রায়
১৯. নিখিল রায়
২০. ৺ভগীরথ সূত্রধর
২১. ৺হারাধন দত্ত
২২. ৺হরলাল বর্ধন
২৩. ৺জয়ন্ত দেশমুখ
২৪. ৺সুনীল চক্রবর্তী
২৫. শতাব্দী রায়
২৬. গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য
২৭. ৺সৌগত রায়
২৮. হিরালাল চ্যাটার্জি
২৯. ৺চন্দ্রশেখর বোস
৩০. জনার্দন ঘোষ
৩১. সুবলচন্দ্র কংসবণিক
৩২. মৌসুমী চক্রবর্তী
৩৩. ৺মিহিরকান্তি মুখোপাধ্যায়
৩৪. সত্যরঞ্জন মণ্ডল
৩৫. সজলকৃষ্ণ চন্দ
৩৬. অশোককুমার দাস
৩৭. শিশিরকুমার হাজরা
৩৮. রবীন্দ্রনাথ রায়
৩৯. ৺গোপালচন্দ্র গুহ
৪০. জয়দেব সাহা
৪১. বর্ণালী ধর
৪২. প্রণবরঞ্জন বসু
৪৩. টোকন দাস
৪৪. কালাচাঁদ কুণ্ডু
৪৫. ৺সুশান্তকুমার দত্ত
৪৬. প্রদ্যোৎকুমার ঘোষ
৪৭. প্রদীপ দাস
৪৮. শ্যামলকুমার বসু
৪৯. ৺শ্রীদাম সাহা
৫০. বিশ্বজিৎ খাস্তগীর
৫১. প্রদীপ সাহা
৫২. ৺বাসন্তী রায়
৫৩. অসীমকুমার দাস
৫৪. বিষ্ণুজীবন চক্রবর্তী
৫৫. জয়দেব বারুই
৫৬. তারক মজুমদার
৫৭. স্বপন রায়
৫৮. অপরেশ মজুমদার
৫৯. ৺মদনমোহন লাহা
৬০. রতন মল্লিক
৬১. গোপাল ভৌমিক
৬২. মণিশংকর গুপ্ত
৬৩. পঙ্কজকুমার সরকার
৬৪. মহামায়া ঘোষ
৬৫. রামকৃষ্ণ ঘোষ
৬৬. সুব্রত বিন্দু
৬৭. পূর্ণেন্দু বসু
৬৮. শুভেন্দু মুখার্জি
৬৯. আশিস দাস
৭০. অপরেশ সরকার
৭১. দিলীপ ভট্টাচার্য
৭২. তরুণ চক্রবর্তী

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 23

যাঁরা আজীবন সদস্যপদ অর্জন করেছেন

৭৩. রবিশংকর পাল
৭৪. বীণা পাল
৭৫. দীপ্তা মজুমদার
৭৬. প্রশান্তকুমার চ্যাটার্জি
৭৭. গৌতম সূত্রধর
৭৮. অঞ্জন নাথ
৭৯. পূর্বা দাস
৮০. স্বপন নাথ
৮১. রাধাগোবিন্দ পোদ্দার
৮২. সুজিত দে
৮৩. দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী
৮৪. ললিতকুমার বিশ্বাস
৮৫. মধুসূদন দাস
৮৬. কল্যাণ মল্লিক
৮৭. প্রভঞ্জন সরকার
৮৮. সমীরকুমার ব্যানার্জি
৮৯. হরেকৃষ্ণ দে
৯০. ইলা গোস্বামী
৯১. সুমনা দত্ত চক্রবর্তী
৯২. খায়রোজ মণ্ডল
৯৩. মৃণালকান্তি ব্যানার্জি
৯৪. নারায়ণশংকর দাস
৯৫. সুব্রত কর্মকার
৯৬. সঞ্জয় মহাপাত্র
৯৭. চন্দন শূররায়
৯৮. সোমেশ ভূঁইঞা
৯৯. আশিসকুমার দাস
১০০. নবনীতা মুখার্জি
১০১. সনাতন সেন
১০২. অজয় চক্রবর্তী
১০৩. *ড. শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য
১০৪. শাশ্বতী ভট্টাচার্য
১০৫. পরিতোষ গুহ
১০৬. শক্তিপদ মজুমদার
১০৭. জুবিলী ঘোষ সাহা
১০৮. সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়
১০৯. অমিতাভ ভট্টাচার্য
১১০. প্রসূন মুখোপাধ্যায়
১১১. সন্ত বসু
১১২. তরুণকান্তি চৌধুরী
১১৩. অরূপকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৪. সুমন বসাক
১১৫. নির্মল সিংহ
১১৬. ড. ভাস্কর কয়াড়ী
১১৭. সুমঙ্গল সিংহ
১১৮. করবী ভুঁইঞা
১১৯. কমলেশ চট্টোপাধ্যায়
১২০. সুমিত সাহা
১২১. অনুপ সরকার
১২২. ধনঞ্জয় মণ্ডল
১২৩. সব্যসাচী চৌধুরী
১২৪. হরবোলা সুনীল আদক
১২৫. *তুষার ভট্টাচার্য
১২৬. ডাঃ প্রণবকুমার রায়
১২৭. অরুণাংশু বিশ্বাস
১২৮. তিমিরবরণ সরস্বতী
১২৯. হরিপদ গঙ্গোপাধ্যায়
১৩০. দেবব্রত সরকার
১৩১. রাজকুমার দাস
১৩২. শেখ শাহাজাদা
১৩৩. মাধব রায়
১৩৪. তাপস ভট্টাচার্য
১৩৫. সুদীপরঞ্জন ঘোষ
১৩৬. ভৈরব বাদ্যকর
১৩৭. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়
১৩৮. শম্পা বসু
১৩৯. *দীনবন্ধু চৌধুরী
১৪০. অনুপম রায়
১৪১. সুশীল পাত্র
১৪২. সুশান্ত মণ্ডল
১৪৩. বলরাম হালদার
১৪৪. লক্ষ্মী দাস (লিন্ডা)
১৪৫. অনুপ নিয়োগী
১৪৬. শ্রাবণী ঘোষ
১৪৭. অনুপ কান্তি উকিল
১৪৮. দেবজিৎ মল্লিক
১৪৯. সহেলী রায়
১৫০. মৃন্ময় ঘোষ
১৫১. গোপাল আইচ
১৫২. রতন ঘোষ
১৫৩. জগন্ময় চক্রবর্ত্তী
১৫৪. শ্রুতি ঘোষ
১৫৫. কুমুদ রঞ্জন চক্রবর্তী
১৫৬. নবীন সেনগুপ্ত
১৫৭. পার্থসারথী চ্যাটার্জী
১৫৮. রিক্তা ঘোষ
১৫৯. হরপ্রসাদ মুখার্জী
১৬০. মানস রায়
১৬১. অমিত ভৌমিক
১৬২. মৃদুলা দাস সরকার
১৬৩. শোভা পাল
১৬৪. মৌসুমী মল্লিক
১৬৫. সৌরেন শর্মা
১৬৬. চম্পা কুশারী
১৬৭. সুবীর নস্কর
১৬৮. পূর্ণেন্দু জানা
১৬৯. সোনালী ঘোষ
১৭০. রবীন্দ্রনাথ পাত্র
১৭১. শুভাশিষ দাস বর্মন
১৭২. চেতন সাহা

** মরণোত্তর সম্মানার্থে প্রয়াতদের নামও ছাপা হয়েছে ।*

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 24

SAB PAYECHIR ASAR

FOUNDATION

Sab Payechir Asar was established on 29th July, 1945 by late Akhil Neogi with the pen-name 'Swapan Buro'. Our founder was an eminent writer, specially in the field of children's literature. He was a talented artist, a successful editor, and above all a great visionary. Choice of the name 'Sab Payechir Asar' was inspired by the noble spirit contained in Rabindranath Tagore's Well-known poem 'Sab Payechir Desh'. The name was proposed by Poet Sunirmal Bose. The Asar started functioning on the strength of the initiative and zealous efforts of a handful of young boys and girls. Gradually the movement gathered momentum and branches were set up one after another in different parts of the country.

AIMS AND CHARACTERISTICS

The main aim of Sab Payechir Asar is to help children grow as creative and successful citizens of a secular, democratic and egalitarian state rich with human values. For Attaining this goal, Sab Payechir Asar, both at the main centre and through the numerous affiliated branch units, carries on regular field and indoor activities designed to strengthen physical, mental and social health of children and adolescents. Our programmes seek to enhance their social consciousness, sensitise them to contemporary issues and refine their aesthetic sense. Our courses of joyful learning augment their physical abilities including skill in sports and games, and nurture their talents in various cultural activities. Through educational tours and training camps the children learn the value of collective living in the spirit of sharing and caring. We may humbly submit that our multidimensional endeavour has brought us recognition as a movement supplementary to school education. We also claim to be a non-political, non-religious and non-profit making voluntary social venture.

MEMBERSHIP

Membership of Sab Payechir Asar is open to all children upto 16 years of age irrespective of caste, creed, religion, language or nationality. We call these members 'Sonar-Kathis' which means 'golden sticks'.

EXPANSION

It is fascinating for us to go down memory lane and recount our Asars evolution since a modest beginning two years before independence. With branches spread over a wide geographical area our message has crossed the national boundaries. We have developed cordial relation with similar organisations of several countries abroad. A few of our neighbouring states have, infact, opened branches of Sab-Payechir Asar for their children. Our Sonarkathis come from all strata of social life rich and poor, urban and rural. Our affiliated units are working in villages, towns and big cities. In many cases our units are considered as a wing of schools and also as children sections of large clubs and associations. It is really gratifying for us to note that a large number of eminent persons holding responsible positions were Sonarkathis in their childhood days. They still cherish happy memory of those golden years.

CONSTITUTION

The structure and functions of Sab Payechir Asar---both at the Main Centre and in the branch units---are guided and regulated by its own constitution. This well-designed document was adopted for facilitating our journey towards the goal. Times are changing. Every now and then new opportunities open up, new problems also raise their heads. We try to amend the constitution and modify and re-design our programmes in order to promote the positive changes and, at the same time, resist the harmful trends of the modern society.

AREAS OF WORK

Following the ideal of basic education, our goal is to develop every child as a complete human being. Naturally our activities are planned to focus mainly on the essential co-curricular components of school education. Major part of our programmes relates to physical training including various types of sports and games. Value-loaded cultural activities are undertaken to enrich the children's aesthetic taste and elevate their moral standards. Discussions, debates and contests on different social issues are arranged to broaden the horizons of their knowledge, sharpen their thought

process, awaken social consciousness which are reflected in their attitude and behaviour.

Our day-to-day work schedules also include classes in music, dance, recitation, general knowledge, drawing and painting etc. Our social service department organises blood-donation camps, relief work during natural disasters, literacy classes for the underprivileged children. We arrange seminars and 'meet-the-scientist' sessions to arouse the members' interest and awareness about different aspects of environment - both physical and social. The week-long Annual Training Camp organised by us in different districts bring to us a great opportunity for providing centralised training, demonstration and evaluation of the outcome of our efforts. More than a thousand boys and girls from units spread over the country spend these seven days of rigorous training and disciplined camp life in a spirit of togetherness. Fraternal delegates from abroad also join these camps and offer scope for exchange of ideas. Dignitaries from all walks of life pay visit to our camp and inspire us with their words of goodwill. On the concluding day, the members find it difficult to hold back tears. These camps are unique occasions for 'learning to live together, as recommended by the famous Dellors commission in its report titled 'learning : The Treasure within'.

With a view to strengthening our organisation, we arrange consultation and training sessions for organisers, workers and trainers at branch, zonal and central levels. To disseminate our views, plans and programmes, we publish journals, sovenirs, training manuals and guide books.

We are trying to be proactive and to get up our organisation so as to meet the challanges of tomorrow by updating and diversifying our programmes. Our Central Children Home (Kendriyo Sishu Bhaban) at 4, James Long Sarani, Kolkata a long cherished dream of our Founder Swapan Buro is gradually shaping into an actual Children Home. We are also arranging dormitory facilities there for children and youth Leaders who often have to stay in Kolkata for few days for medical and educational purposes.

We are also providing our Hall for Cultural and Social welfare programme of other local organisation for ultimate development of the Society.

OUR AIMS

* **S** *portsmanship is our principal. Sabpayechir Asar live to behave like a real sportsman.*
* **P** *artriotism is our Aim. Sabpayechir Asar trains to become Patriot.*
* **A** *ssociation is our target. Sabpayechir Asar loves all association which are good.*
* **C** *ollective Spirit and Cleanliness.*
* **A** *ctivity and Adventure.*
* **M** *aintenance and Making things.*
* **P** *hysical Health and Pleasantness.*

সবপেয়েছির আসর / সভাপতি

- চক্রবর্তী রাজা গোপাল আচারিয়া, রাজ্যপাল, প.ব. (১৯৪৮-১৯৫৫)
- ড: কালিদাস নাগ ঐতিহাসিক (১৯৫৫-আমৃত্যু)
- তুষারকান্তি ঘোষ কিংবদন্তী সাংবাদিক (১৯৯৪ পর্যন্ত)
- অধ্যাপক বুদ্ধদেব চক্রবর্তী অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজ (১৯৯৭ পর্যন্ত)
- অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায় উপাচার্য, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৭-২০১৪)
- ড. রমেশচন্দ্র বসু প্রাণী বিজ্ঞানী, প্রশাসক জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (২০১৪-২০১৬)
- কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, প্রশাসক, ক্রীড়া সংগঠক (২০১৬ থেকে)

সবপেয়েছির আসরে বিভিন্ন সময়ের মূলসত্যসেবী

১৯৪৭-৫০	শ্যামল দেব
১৯৫১	বুদ্ধদেব চক্রবর্তী
১৯৫২	রমাকান্ত দত্ত
১৯৫৩	শ্যামল দেব
১৯৫৪-৫৫	বুদ্ধদেব চক্রবর্তী
১৯৫৬	অজিত বসু
১৯৫৭	উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৫৮-৫৯	সৌরেন রায়চৌধুরী
১৯৬০	বুদ্ধদেব চক্রবর্তী
১৯৬১-৬৩	অজিত বসু
১৯৬৪-৬৬	বুদ্ধদেব চক্রবর্তী
১৯৬৭-৬৮	সুনীল সেনগুপ্ত
১৯৬৯-৭১	অমল মুখোপাধ্যায়
১৯৭২-৭৩	(অ্যাডহক) সৌরেন রায়চৌধুরী
১৯৭৮	(অ্যাডহক) সৌরেন রায়চৌধুরী
১৯৭৯-৮১	কিরণশংকর চট্টোপাধ্যায়
১৯৮২-৮৩	প্রদীপ রায়
১৯৮৪-৮৫	অপূর্ব গঙ্গোপাধ্যায়
১৯৮৬-৮৭	জয়ন্ত দেশমুখ
১৯৮৮-৮৯	অপূর্ব গঙ্গোপাধ্যায়
১৯৯০-৯১	প্রদীপ রায়
১৯৯২-৯৬	জয়ন্ত দেশমুখ
১৯৯৭-৯৮	সোমেশ ভূঁইঞা
১৯৯৯-২০০০	শ্রীদাম সাহা
২০০১-২০০২	দিলীপ চক্রবর্তী
২০০৩-২০০৪	বিশ্বজিৎ খাস্তগীর
২০০৫-২০০৬	মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
২০০৭-২০০৮	তরুণ চক্রবর্তী
২০০৯-২০১০	শ্রীদাম সাহা
২০১১-২০১২	সনৎ ভট্টাচার্য
২০১২-২০১৪	বিশ্বজিৎ খাস্তগীর
২০১৪-২০১৫	শ্যামলকুমার বসু
২০১৬-২০১৭	মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
২০১৮-২০২০	সব্যসাচী চৌধুরী
২০২১-২০২৩	দিলীপ চক্রবর্ত্তী

সবপেয়েছির আসর । মূলকেন্দ্র

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : মাননীয় রাজ্যপাল । পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পৃষ্ঠপোষক মণ্ডলী ২০২১-২২ / ২২-২৩

শ্রীব্রাত্য বসু	মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী পঃ বঃ সরকার
শ্রীঅরূপ বিশ্বাস	মাননীয় ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী প. ব. সরকার
শ্রীমতি ডাঃ শশী পাঁজা	মাননীয়া সমাজ ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী প. ব. সরকার
অধ্যাপক অজয় রায়	প্রাক্তন ডিরেক্টর, আই আই ই এস টি, শিবপুর
ড. অতীন্দ্রনাথ দে	উপাচার্য, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
ড. সত্যব্রত চক্রবর্তী	সম্পাদক, এশিয়াটিক সোসাইটি

উপদেষ্টা মণ্ডলী

প্রধান উপদেষ্টা	:	শ্রীঅজিত ব্যানার্জী
উপদেষ্টামণ্ডলি	:	ড. রমেশচন্দ্র বসু, গণেশ ঘোষ, অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকার মুখোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ মুজমদার, পান্না কায়সার, প্রণয় সাহা, প্রতাপ থাপা, ঋতুরাজ সাপকোটা, রিক্তা ঘোষ, মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়, অজন্তা দে (দেব), শ্যামলকুমার বসু, সজলকৃষ্ণ চন্দ, মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য, অশোক বসু, সোমেশ ভূঁইঞা, মহামায়া ঘোষ, স্বপন ঘোষ, গোপাল আইচ, বাণী সরস্বতী ও শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়।

এঁরাই মোদের বরণীয়

সবপেয়েছির আসর - শৈশব থেকেই দেশের দশের বরেণ্য মানুষদের সঙ্গে সোনারকাঠিদের পরিচিত ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলতে বিশেষ উদ্যোগী। প্রতিটি শাখা আসরে প্রণম্য মনীষীদের জন্মজয়ন্তী, সাহিত্য সভা, নয়ত তালিকাটি প্রদর্শন করা যেতে পারে। বৈশাখ পূর্ণিমা (বুদ্ধজয়ন্তী)। ১৪ এপ্রিল (আম্বেদকর), ১৮ এপ্রিল (ডিরোজিও), ২৫ বৈশাখ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), ১১ জ্যৈষ্ঠ (কাজী নজরুল ইসলাম), ১৩ আষাঢ় (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), ১৪ আষাঢ় (আশুতোষ মুখোপাধ্যায়), ১৬ শ্রাবণ (প্রফুল্লচন্দ্র রায়)। ২২ শ্রাবণ (রবীন্দ্রপ্রয়াণ), ৩০ শ্রাবণ (সুকান্ত জয়ন্তী), ৩১ ভাদ্র (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), ১২ আশ্বিন (বিদ্যাসাগর), ফাগুন (শ্রীচৈতন্য), ১২ জানুয়ারী (স্বামী বিবেকানন্দ), ২৩ জানুয়ারি (নেতাজি সুভাষচন্দ্র), ১০ মে (গুরুসদয় দত্ত), ১ জুলাই (ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়), ১৫ আগষ্ট (শ্রীঅরবিন্দ), ২ অক্টোবর (মহাত্মা গান্ধি), ২৭ অক্টোবর (স্বপনবুড়ো), ২৮ অক্টোবর (ভগিনী নিবেদিতা), ১৪ নভেম্বর (জওহরলাল নেহরু ও শিশুদিবস), ৩০ নভেম্বর (জগদীশচন্দ্র বসু), ৩ ডিসেম্বর (শহিদ ক্ষুদিরাম বসু)।

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 28

সবপেয়েছির আসর (মূলকেন্দ্র)

কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক মণ্ডলী ২০২১-২০২৩

মুখ্য প্রশিক্ষক : শ্রী অনুপ কান্তি উকিল

প্রশিক্ষক মণ্ডলী : বীণা পাল, পরিতোষ গুহ, বিশ্বজিৎ খাস্তগীর, সহেলী রায়, দীপ্তা মজুমদার, প্রদীপ সাহা, দেবব্রত সরকার, হরপ্রসাদ মুখার্জী, পূর্বা দাস, সনাতন সেন, সুজিত দে, করবী ভুঁইঞা, রতন মল্লিক, লিভা দাস, গৌতম সূত্রধর, মালবিকা চক্রবর্তী, দীপেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী, অজিত ব্যানার্জী, বর্ণালি ধর, দীপঙ্কর দাস, অনুপম রায়, সুমিত্রা জানা, জয়দেব সাহা, নবীন সেনগুপ্ত, খায়রোজ মণ্ডল, বুদ্ধদেব বসু, মৃন্ময় ঘোষ, আখতারুল হোসেন জমাদার, কৃষ্ণরঞ্জন চক্রবর্তী, কমল সাহা, অনুপ সরকার, অঞ্জন নাথ, অষ্টমী বাস্কে, দেবজিৎ মল্লিক ও টুম্পা মল্লিক।

কেন্দ্রীয় সংগঠক প্রশিক্ষক পর্ষদ

১। আলিপুরদুয়ার :—

প্রধান উপদেষ্টা : মহেন্দ্র দেবনাথ।

সংগঠক : রতন ঘোষ।

সহঃ সংগঠক : আশীষ অধিকারী।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষক : রূপজিৎ দাস, জয়ন্ত দাস, লিটন দত্ত।

২। আসানসোল :—

প্রধান উপদেষ্টা : সোমনাথ গড়াই।

উপদেষ্টা মণ্ডলী : প্রণব দাস, বিশ্বজিৎ নাহা, মৌসুমী চ্যাটার্জী, ধরমবীর সাউ, বরুণ ব্যানার্জী, পরিমল পাল।

যুগ্ম সংগঠক : অরুণাংশু বিশ্বাস, রবিশংকর পাল।

সহঃ সংগঠক : সমীর ব্যানার্জী, মাধব রায়।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষক : চেতন সাহা, শোভা পাল, বিশ্বজিৎ বণিক।

৩। উত্তর কলকাতা :—

প্রধান উপদেষ্টা : মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

উপদেষ্টা মণ্ডলী : পুলক রঞ্জন দে, বরুণ গাঙ্গুলি, গণেশ দাস, সুশীল ভৌমিক, সুবীর কর।

সংগঠক : শিবাশীষ বিশ্বাস।

সহঃ সংগঠক : ধীমান সাহা, গণেশ হালদার।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষক : গীতা বাইন, সুম্পি প্রজাপতি, কবিতা প্রজাপতি, উমাশংকর পাল, রাজদীপ মল্লিক।

সহায়ক : প্রত্যুষ মুখার্জী, অয়ন মণ্ডল।

৪। উত্তর ২৪ পরগণা ১ বারাসাত :—

প্রধান উপদেষ্টা : শুভেন্দু মুখার্জী।

উপদেষ্টা মণ্ডলী : পূর্ণেন্দু বসু, মধুসূদন সাহা, শ্যামল কুমার বসু, জয়দেব বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ খাস্তগীর।

সংগঠক : প্রসূন মুখার্জী।

সহঃ সংগঠক : অজিত বড়ুয়া, সুশান্ত মণ্ডল, তপন বিশ্বাস।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষক : সীমা দে বণিক, চম্পা কুশারি, শোভন ঘোষ, সুনীতা মণ্ডল, অনুপম পাল, সুরজিৎ কর্মকার।

সহায়ক : চম্পা দত্ত, অসীম দাস, সরস্বতী সেন।

৫। উত্তর ২৪ পরগণা ২ বারাকপুর :—

প্রধান উপদেষ্টা : নূপুর দে দাস।

উপদেষ্টা মণ্ডলী : শ্যামল বড়ুয়া, শৈবাল ভড়।

যুগ্ম সংগঠক : মনিতোষ বিশ্বাস, মৃদুলা দাস সরকার।

৬। উত্তর নদিয়া :—

প্রধান উপদেষ্টা : হরিপদ গাঙ্গুলি।

উপদেষ্টা মণ্ডলী : বনোয়ারী মজুমদার, শ্যামল ভৌমিক, সুশীল চক্রবর্তী, মীর আজগর আলী, পুলক নাহা, অশোক দেবনাথ, অশোক কুণ্ডু।

সংগঠক : সুমন বসাক।

সহঃ সংগঠক : রাজ কুমার দাস, অতীন সরকার।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষক : স্বপন নাথ, দীপক পাল, দেবাশীষ সরকার, পুর্বা দাস।

সহায়ক প্রশিক্ষক : প্রসেনজিৎ রায়, বিধান সাহা।

৭। কোচবিহার :—

প্রধান উপদেষ্টা : অজিত বর্মণ।

সংগঠক : নির্মল সিংহ।

৮। জামুরিয়া :—

সংগঠক : স্বপন জমিদার।

সহঃ সংগঠক : বিভাস কর্মকার।

৯। ঝাড়গ্রাম :—

প্রধান উপদেষ্টা : হরিপদ মাহাতো।

উপদেষ্টামণ্ডলী : অমিত পান্ডে, সত্যজিৎ মাহাতো।

যুগ্ম সহঃ সংগঠক : স্বরূপ বিশুই, সুব্রত বৈদ্য।

১০। দক্ষিণ কলকাতা :—

প্রধান উপদেষ্টা : হীরালাল চ্যাটার্জি।

উপদেষ্টামণ্ডলী : অসীম দাস, তাপসী দত্তগুপ্ত, স্বাতী চক্রবর্তী, সঙ্গীতা ভট্টাচার্য, রঞ্জিত দাস, অমিয় পোল্লে।

সংগঠক : সজল সরকার।

সহঃ সংগঠক : বিভাস দত্তগুপ্ত।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষক : তীর্থিক দত্তগুপ্ত।

১১। দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রধান উপদেষ্টা : দুলাল চন্দ্র দাস।

উপদেষ্টামণ্ডলী : ডা: খোকন সেন, অমল পাত্র, ডা: সুবোধ চ্যাটার্জি, সুমনা মান্না, ডালিয়া মণ্ডল।

সংগঠক : আশিস দাস।

সহঃ সংগঠক : সুশীল পাত্র।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষক : সমর মণ্ডল, পল্লবী ভৌমিক।

সহায়ক প্রশিক্ষক : পৌলমী ভৌমিক।

১২। দক্ষিণ নদিয়া :—

প্রধান উপদেষ্টা : বিভূতি ভূষণ পাল।

উপদেষ্টামণ্ডলী : খগেন্দ্রনাথ প্রামাণিক, ছায়া ব্যানার্জি, প্রদীপ সেন, জহর মজুমদার।

যুগ্ম সংগঠক : তপন দাস ও অমিতাভ ভট্টাচার্য।

১৩। দার্জিলিং :—

প্রধান উপদেষ্টা : ভাস্কর দত্তমজুমদার।

উপদেষ্টামণ্ডলী : হিরন্ময় হাজরা, স্বপন রায়, সনৎ দাস, স্বপন মুহুরি।

সংগঠক : সুবোধ ঘোষ।

সহঃ সংগঠক : বিজয় দাস।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষক : শাশ্বতী ঘোষ দত্ত মজুমদার।

১৪। দুর্গাপুর :—

প্রধান উপদেষ্টা : অজয় চক্রবর্তী।

উপদেষ্টামণ্ডলী : নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বর শেঠ, গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য, সঞ্জয় মহাপাত্র, কিশোর সর।

সংগঠক : পরিমল দাস।

সহঃ সংগঠক : শতাব্দী রায়।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষক : দিলীপ শেঠ, বিল্টু বণিক, সাগর ধীবর।

১৫। পশ্চিম মেদিনীপুর :—

প্রধান উপদেষ্টা : চঞ্চল মাসান্ত।

উপদেষ্টামণ্ডলী : নিকুঞ্জ বারিক, জীতেশ হোড়, অরূপ কুমার ব্যানার্জি, শিবপ্রসাদ সেন, রতন সরখেল, শিবশংকর ব্যানার্জি।

সংগঠক : পূর্ণেন্দু জানা।

সহঃ সংগঠক : পরিস্কার মাহাতো, সুব্রত খাঁড়া।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষক : মিতা চৌধুরি।

১৬। পুরুলিয়া :—

প্রধান উপদেষ্টা : বিঘ্নেশ্বর সিংহ মোদক।

উপদেষ্টামণ্ডলী : ডঃ জয়দেব গায়েন, সমীরকুমার গড়াই, নির্মল কুমার রক্ষিত, ডাঃ নয়ন মুখোপাধ্যায়, প্রভাকর মাহাত, রবিলোচন দত্ত।

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 30

সংগঠক : অনুপ নিয়োগী।

সহঃ সংগঠক : সুশান্ত প্রামাণিক।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষক : সৌরভ নিয়োগী, সুমন্ত্র সিংহ, অনিতা মোদক, সুমিত্রা গায়েন।

১৭। পূর্ব নদিয়া

প্রধান উপদেষ্টা : বিমলেন্দু সিংহ রায়।

উপদেষ্টামণ্ডলী : খাদেমুল ইসলাম, সুব্রত প্রামাণিক, বিজয় বণিক।

সংগঠক : বেনজিরা খাতুন।

সহঃ সংগঠক : দেবব্রত সিংহ, সুমিত সরকার।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষক : দীপক রায়, সুখেন বিশ্বাস।

১৮। পূর্ব মেদিনীপুর :—

প্রধান উপদেষ্টা : গৌতম জানা।

উপদেষ্টামণ্ডলী : কার্তিক সাঁতরা, দীলিপ বেরা।

সহঃ সংগঠক : অর্ঘ্য মান্না।

১৯। বাঁকুড়া :—

প্রধান উপদেষ্টা : তপন কুমার গুপ্ত।

উপদেষ্টামণ্ডলী : তাপস ভট্টাচার্য, কৃষ্ণসরণ ঘোষ।

সংগঠক : ধনঞ্জয় মণ্ডল।

সহঃ সংগঠক : মণিশংকর গুপ্ত, সুদীপ রঞ্জন ঘোষ।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষক : স্বাতী সেনগুপ্ত, সোনালি ঘোষ, অঞ্জন ভট্টাচার্য।

সহায়ক প্রশিক্ষক : রাকেশ সরকার।

২০। বীরভূম :—

উপদেষ্টা : ড. ভাস্কর কয়াড়ি, নির্মল মণ্ডল।

সংগঠক : কিশোর সেন।

সহঃ সংগঠক : সত্যব্রত ব্যানার্জি।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষক : ডঃ উজ্জ্বল মুখার্জি।

২১। মালদহ :—

প্রধান উপদেষ্টা : মহ: সফিউদ্দিন আহমেদ।

উপদেষ্টামণ্ডলী : অঞ্জনা রায়, প্রবাল লালা।

সংগঠক : মানস রায়।

সহঃ সংগঠক : প্রশান্ত কুমার দাস।

২২। মুর্শিদাবাদ :—

প্রধান উপদেষ্টা : স্বপন ঘোষ।

উপদেষ্টামণ্ডলী : ইন্দ্রনাথ মজুমদার, ছবিরঞ্জন মজুমদার, ডঃ ইন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, আশিষময় চৌধুরি, রুদ্রদেব চক্রবর্তী, শুভ্র রায়, মহামায়া ঘোষ।

যুগ্ম সংগঠক : কুমুদরঞ্জন চক্রবর্তী, পার্থসারথি চ্যাটার্জি।

সহঃ সংগঠক : স্নেহাশিস ঘোষ।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষক : শ্রাবণী ঘোষ, উর্মি মৈত্র, কাশীনাথ রক্ষিত, প্রণব কৃষ্ণ দাস।

সহায়ক প্রশিক্ষক : মৌলি সাহা, নাসিমা খাতুন, বহ্নি চক্রবর্তী।

২৩। হাওড়া :—

সংগঠক : অমিয় নস্কর।

সহঃ সংগঠক : সুবীর গাঙ্গুলি, রাজশ্রী সাহা।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষক : সুবীর নস্কর, মৌসুমী মল্লিক

২৪। হুগলি :—

প্রধান উপদেষ্টা : ফাল্গুনী দত্ত মজুমদার।

উপদেষ্টামণ্ডলী : গোপাল আইচ, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুবল কংসবণিক, নারায়ণ শংকর দাস।

সংগঠক : মধুসূদন দাস।

সহঃ সংগঠক : শংকর চক্রবর্তী, বাসুদেব সেন।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষক : চন্দন দেবনাথ, সুমনা দত্ত চক্রবর্তী, দেবাশীষ সাহা, সৌমেন দে, কৃষ্ণলাল রায়, সৌমেন প্রামাণিক, সৌরেন শর্মা।

শাখা আসর দেশে-বিদেশে

১। আলিপুরদুয়ার :—

প্রান্তিক	—	আলিপুরদুয়ার
নিগমানন্দ	—	জিৎপুর
রবীন্দ্র শিশুতীর্থ	—	আলিপুরদুয়ার
সবুজ ডুয়ার্স	—	আলিপুরদুয়ার
রামকৃষ্ণ সারদা জ্ঞানপীঠ	—	চেঁচাখাতা
খোয়ারডাঙ্গা বিবেক বৃন্দ	—	আলিপুরদুয়ার
মুক্ত ধারা	—	ধুবরি (আসাম)

২। আসানসোল :—

আসানসোল গ্রাম	—	আসানসোল
শ্রীসংঘ	—	শ্রীপল্লী
মহিশীলা কিশলয়	—	মহিশীলা
রেল কলোনী কল্পতরু	—	বার্ণপুর
মহিশীলা সোনালী	—	মহিশীলা কলোনী
বিধানপল্লী	—	বিধানপল্লী
মিতালী সংঘ	—	সেনর‍্যালে
সায়ক	—	বহুলা
দীপান্বিতা	—	বার্ণপুর
সিদুলী	—	সিদুলী
ঐকতান	—	নিউ আপার চেলিডাঙ্গা
নিঙ্গা বহ্নিশিখা	—	নিঙ্গা
অভ্যুদয় গোষ্ঠী	—	রাণীগঞ্জ
নব কল্যাণ বিদ্যামন্দির	—	বড়ধেমো
কবিতীর্থ চুরুলিয়া	—	চুরুলিয়া

৩। উত্তর কলকাতা :—

মুরারিপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ	—	উল্টোডাঙ্গা
কিশোরচক্র	—	উল্টোডাঙ্গা
অগ্নিশিখা	—	মুরারিপুকুর
গোপীমোহন	—	শ্যামপুকুর
নবমিতালি	—	দেশবন্ধু পার্ক
নবদিগন্ত	—	দমদম
নিবেদিতা	—	বাগবাজার
ট্যাঙরা মাদার টেরিজা	—	নিউ ট্যাঙরা
তিতলি	—	বলরাম ঘোষ স্ট্রিট
হাতিবাগান স্বামীজি	—	হাতিবাগান
বলাকা	—	রাজা মনীন্দ্র রোড
সুধীর পাল প্রাথমিক বিদ্যালয়	—	অধর দাস লেন

৪। উত্তর ২৪ পরগণা (১) ও বারাসাত :—

মানবতা	—	হৃদয়পুর
রক্তরবি	—	অশোকনগর
চলন্তিকা	—	নববারাকপুর
নববারাকপুর নবাকাঙ্ক্ষী	—	নববারাকপুর
বারাসাত অভিযান	—	বারাসাত
আগুয়ান সংঘ	—	পূর্বকালিকাপুর
বর্ণালী	—	দোলতলা
কিশলয়	—	নববারাকপুর
কচি কাঞ্চন	—	বাদুড়িয়া
ভেদিয়া সবুজসাথী	—	বসিরহাট
বিবেকানন্দ সেবা সমিতি	—	বারাসাত
আদর্শপল্লী ঐকতান	—	বাগুইআটি
নৈঋতা অ্যাকাডেমি	—	বারাসাত
হাতিয়ারা খেয়া	—	হাতিয়ারা
নতুন প্রভাত	—	বাদুড়িয়া

৫। উত্তর ২৪ পরগনা (২) ও বারাকপুর :—

পূবালি	—	বেলঘরিয়া
নবোদয়	—	নৈহাটি
সপ্তর্ষি	—	কাঁচরাপাড়া
কল্পতরু	—	বারাকপুর
মহুয়া	—	সোদপুর
নবারুন শিশু মিলন	—	পানিহাটি

৬। উত্তর নদিয়া :—

রানাঘাট	—	রানাঘাট
বগুলা	—	বগুলা

রানাঘাট কোর্টপাড়া সংঘ	—	কোর্টপাড়া
ছাত্রসংঘ	—	তাহেরপুর
আড়ংঘাটা	—	আড়ংঘাটা
তরুণিমা	—	দত্তপুলিয়া
রাঘবপুর	—	হবিবপুর
কালীনারায়ণপুর সুহৃদ সংঘ	—	কালীনারায়ণপুর
বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচার	—	হালালপুর
রামমোহন	—	রানাঘাট
নাসরা	—	নাসরা
শিশুমিলন	—	তুঁতবাগান
অন্তর্দীপন	—	বরেন্দ্রনগর

৭। কোচবিহার :—

রামপুর	—	রামপুর
অঙ্কুর	—	তুফানগঞ্জ
দেবগ্রাম	—	তুফানগঞ্জ
তুফানগঞ্জ সূর্যোদয়	—	তুফানগঞ্জ
বিদ্যাসাগর	—	নয়ারচর
নবপ্রগতি	—	দিনহাটা
মাথাভাঙা আনন্দমেলা	—	মাথাভাঙা

৮। জামুরিয়া :—

সব্যসাচী	—	জামুরিয়া

৯। ঝাড়গ্রাম :—

জঙ্গলমহল	—	বিড়িহাড়ি, ঝাড়গ্রাম
নেতুরা	—	নেতুরা

১০। দক্ষিণ কলকাতা :—

বাঘাযতীন	—	বাঘাযতীন
চেতলা	—	চেতলা
সতীন সেন স্মৃতিসংঘ	—	সরশুনা
সবুজসাথী	—	কলাবাগান
গার্ডেনরীচ	—	গার্ডেনরীচ
বেহালা বোধয়ন	—	সরশুনা
লহরী	—	বেহালা
ভোরের তারা	—	সরশুনা
মুক্তি	—	মাঝেরহাট
কৃষ্টিচক্র	—	বেহালা
বালিগঞ্জ ব্রতী	—	মনি মুখার্জি রোড
দিশারী	—	বেহালা
ক্ষুদিরাম	—	ঠাকুরপুকুর
নবারুণ	—	এস. এন. রায় রোড

১১। দক্ষিণ ২৪ পরগনা :—

সন্তোষপুর সুকান্ত মেলা	—	সন্তোষপুর
আক্রা নবারুণ	—	আক্রা
সেন্ট অ্যাগনেস	—	মহেশতলা
নবাসন পঞ্চাননতলা	—	বজবজ
সন্দীপন	—	বজবজ
আক্ড়া মঠঘর লক্ষ্মীছানা	—	আক্রা
সন্ধ্যাতারা	—	ফলতা
কলাগাছিয়া কল্পতরু	—	মহেশতলা
সারদা ইনস্টিটিউট	—	সরকারপুল
গোচরণ	—	গোচরণ
পাইকপাড়া শিশু কিশোর	—	বজ বজ

১২। দক্ষিণ নদিয়া :—

সন্ধানী	—	চাকদহ
মদনপুর	—	মদনপুর
শিমুরালী	—	শিমুরালী
রবীন্দ্রনগর মঞ্জরী	—	চাকদহ
লালপুর	—	চাকদহ
কাঁটাগঞ্জ	—	কাঁটাগঞ্জ

১৩। দার্জিলিং :—

পানুদত্ত মজুমদার স্মৃতি	—	শিলিগুড়ি
শ্যামলী রায় স্মৃতি	—	শিলিগুড়ি
ডিপোলাইন শিকারপুর	—	বেলাকোবা
ফটিংঙ্গা	—	বেলাকোবা
সন্ন্যাসী কাটা	—	গড়রা, রাজগঞ্জ

১৪। দুর্গাপুর :—

অমৃতের	—	দুর্গাপুর স্কুল বোর্ড

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 33

দুর্বার — রহিমপুর
পূর্বাভাস — ধান্ডাবাগ
রানার — ধান্ডাবাগ
মনিদীপা — দয়ানন্দ রোড
ধুনারা উদয়ন — বেনাচিতি
দুর্গাপুর ঐকতান — ভিড়িঙ্গি
অজানা — কনিষ্ক
পুরোদীপ — জামালপুর
ভি. কে. নগর বিবেকানন্দ — এ.এম.সি.
নবচৈতালি — সিটি সেন্টার
অনুরাগপুর চৈতালি — পানাগড়

১৫। পশ্চিম মেদিনীপুর :—

বঙ্কিম স্মৃতি — মেদিনীপুর
সৈনিক — কুঁইকোটা
বিদ্রোহী সংঘ — আবাস
রামকৃষ্ণনগর — রামকৃষ্ণনগর
শকুনডিহা স্বামীজি — আনন্দপুর
রবীন্দ্রনগর — রবীন্দ্রনগর
কোলসাণ্ডা — কোলসাণ্ডা
আনন্দপুর — কেশপুর
আসনাসুলি নবীন সংঘ — শালবনী
মিলন শিশু তীর্থ — বাড়ুয়া
শহিদ ক্ষুদিরাম — কর্ণেলগোলা
চিরসাথী — কর্ণেলগোলা
শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠভবন — কর্ণেলগোলা
শ্রীনারায়ণ বিদ্যাভবন — কর্ণেলগোলা

১৬। পুরুলিয়া :—

বরাবাজার তরুণ সংঘ — বরাবাজার
ওম — বরাবাজার
আত্মবিকাশ — ভামুরিয়া
নড়িহা প্রান্তিক — পুরুলিয়া
চরৈবেতি — পুরুলিয়া

১৭। পূর্ব নদিয়া :—

শক্তিনগর — শক্তিনগর
কিঞ্জল — তেহট্ট
পরশমণি — শিবপুর
হাটখোলা হাই মাদ্রাসা — হাটখোলা
সর্বশ্রী সংঘ — বাদকুল্লা
শিল্পী সংঘ — কৃষ্ণনগর
শিশু কিশোর — বেথুয়াডহরী
অভয়নগর ছাত্র সংঘ — অভয়নগর
জাগরণ — কালীগঞ্জ

১৮। পূর্ব মেদিনীপুর

কিশোর জগৎ — বল্লুকহাট

১৯। বাঁকুড়া

বড়জোড়া গ্রাম দীপাবলি — বড়জোড়া
আনন্দমেলা — হাট আশুড়িয়া
সরকারপাড়া তরুণ সংঘ — পখন্না
সত্যাশ্রয়ী — সোনামুখী
সবুজ মঞ্জুরী — রাধামোহনপুর
সেবক সংঘ — আলমপুর
শাশ্বত — প্রতাপপুর
গোপালপুর আমরা ক'জন — পলাশডাঙ্গা
কাশীপুর উত্তরণ — কাশীপুর

২০। বীরভূম :—

সাঁইথিয়া — সাঁইথিয়া
কবি সুকান্ত — আহমেদপুর
লাভপুর তারাশংকর — লাভপুর
বেলাড়ী যজ্ঞেশ্বর
শিশু চেতনা বিকাশ — বেলাড়ী
বাঁশুলী — নানুর

২১। মালদহ :—

বনবাণী — হরিশ্চন্দ্রপুর
হুল্লোড় — মালদহ
মহেন্দ্রপুর — হরিশ্চন্দ্রপুর
কাজী নজরুল — হরিশ্চন্দ্রপুর

২২। মুর্শিদাবাদ :—

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ	—	মুর্শিদাবাদ
জেমো সর্বোদয়	—	কান্দি
বহরমপুর	—	বহরমপুর
ঝর্নাধারা	—	কান্দি
আশার আলো	—	বহরমপুর
পুরন্দরপুর	—	পুরন্দরপুর
রূপপুর রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী	—	কান্দি
ভগবানগোলা ঐশী	—	ভগবানগোলা
মহালন্দী	—	মহালন্দী
সাঁকুড়িয়া	—	নবগ্রাম
জজান মুক্তধারা	—	জজান
পাঁচথুপী শরৎচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়	—	বড়ঞ্যা
জেমো গোলাপ বাগান	—	জেমো রাজবাটী
রসোড়া স্পন্দন	—	রসোড়া
রাজখন্ড আনন্দধারা	—	মহরুল আনন্দপুর
রামনগর আশ্রমী	—	রামনগর

২৩। হাওড়া :—

বি. ই. কলেজ উদয়ন	—	শিবপুর
মানিকপুর	—	মানিকপুর
স্বর্ণযশা	—	বি. গার্ডেন
ছোটদের মহল	—	লিলুয়া
উলুবেড়িয়া নবোদয়	—	উলুবেড়িয়া
জাগরণী	—	বাকসাড়া
বাকসাড়া কিশোর কল্যাণ সংঘ	—	বাকসাড়া
সারেঙ্গা অগ্নিবীণা	—	সারেঙ্গা
কল্যাণব্রত সংঘ	—	উলুবেড়িয়া
তাজমহল	—	খাসখামার
শুভা	—	শিবপুর
সোনারতরী	—	উলুবেড়িয়া

২৪। হুগলী :—

শুকতারা	—	মাহেশ
স্বতন্ত্র	—	রিষড়া
ইলছোবা	—	পান্ডুয়া
সঞ্চিতা	—	ভদ্রেশ্বর
অরবিন্দ পল্লী	—	কোন্নগর
রত্নদীপ	—	গোস্বামী মালিপাড়া
মোড়পুকুর শৈবালিনী দেবী উচ্চ বিদ্যালয়	—	রিষড়া
মাহেশ নবারুণ	—	মাহেশ
অর্জুন	—	রিষড়া
খড়িয়াল বোর্ড	—	কানাইপুর
সঞ্চারি	—	পান্ডুয়া
বিবেকানন্দ পরিষদ	—	কানাইপুর
পূর্বাশা	—	শ্রীরামপুর
আলোকদূত	—	ব্যান্ডেল
বলাকা শিশু সংসদ	—	রিষড়া
কানাইপুর আশার আলো	—	কানাইপুর
আম্বেদকর	—	খন্যান

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস - একটি পর্যালোচনা

ডাঃ নয়ন মুখার্জ্জী

গত ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হল। হৈ হৈ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ঐ দিবসটিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করল। বাস্তবে কি লাভ হল এর পুনর্মূল্যায়ন দরকার।

বিশ্বের বিভিন্ন সময় এক একটি বিষয়ের উপর একটি করে দিবসকে উদ্‌যাপন করা হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস, জলবায়ু দিবস, নারী দিবস, স্বাস্থ্য দিবস, শিশু দিবস ইত্যাদি। ঐ দিনগুলিতে ধুমধাম করে অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিষয়গুলির একটি করে থিমকে কেন্দ্র করে নানা ধরণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কিন্তু পরবর্তী দিনগুলির থেকে আর ঐ বিষয় / দিবসটির গুরুত্ব আমরা হারিয়ে ফেলি। যেমন এ বছরের জলবায়ু দিবস গ্লাসগো শহরে পালিত হল। কোটি কোটি টাকা খরচ করে শতাধিক দেশের প্রতিনিধিত্বে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। যার অন্যতম কার্বন নিঃসরণ কমানো। এর জন্য উন্নত দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য করবে।

২০১৯ সালের জলবায়ু সম্মেলনে সেই একই বিষয় ও একই প্রতিশ্রুতি উন্নত দেশগুলি দিয়েছিল। বাস্তবে তার বিন্দুমাত্র রূপায়ণ হয়নি। কার্বন নিঃসরণও কমেনি আর আর্থিক সাহায্যও করা হয়নি। উপরন্তু জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কয়লা, পেট্রোল, ডিজেলের উৎপাদন বেড়েই চলেছে। স্বভাবতই সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও তার বাস্তবায়নে অনেক ফারাক।

এ বছরের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল Our Planet Our Health অর্থাৎ অন্যভাবে আমাদের স্বাস্থ্য আমাদের গ্রহের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। খুবই বাস্তবসম্মত থিম বা বিষয় এবার প্রকৃত পর্যালোচনায় আসি। পৃথিবীতে প্রতি বছর পরিবেশ দূষণের কারণে মারা যায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ (13 Billion)। অথচ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে যুক্ত এই পরিবেশকে আমরা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। এবার দেখা যাক, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের সম্পর্ক। স্বাস্থ্য মানে শুধু শারীরিক সুস্থ থাকা নয়, এর সাথে মানসিক ও সামাজিক দিকটিও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশের মূল উপাদান যেগুলির উপর আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলী জড়িত তা হল বিশুদ্ধ বাতাস, বিশুদ্ধ জল, বিশুদ্ধ মাটি।

যেভাবে শিল্প, কারখানা, আবাসন, রাস্তা, উন্নয়নের স্বার্থে গড়ে উঠছে তা যথেষ্ট বিপজ্জনক। কারণ জঙ্গল কেটে, রাস্তার পাশের গাছ কেটে এগুলি গড়ে উঠেছে। ফলত বৃক্ষরোপণের পরবর্তী গাছগুলির কোন পরিচর্যা হচ্ছে না। এছাড়া আজ বৃহৎ বৃক্ষ কেটে যে ছোট গাছ লাগান হচ্ছে তা বড় হতে অনেক সময় লাগবে। শিল্প-কারখানার দূষিত গ্যাস বাতাসকে দূষিত করছে।

নদী, পুকুর, জলাশয়গুলি ভরাট হয়ে চলেছে। নদীতে থাকা বালি, যা জল ধরে রাখে তা অনিয়ন্ত্রিতভাবে উত্তোলন হচ্ছে। গ্রীষ্মের আগেই নদীতে বিন্দুমাত্র জল থাকছে না। আবার নদীর ধারে ইঁটের কারখানা, বাসস্থান গড়ে উঠছে। শহরের দূষিত জল, প্লাস্টিক, বর্জ্য নদীতে ফেলা হচ্ছে। একদিকে নদীর গভীরতা কমছে, অন্যদিকে জলধারণ ক্ষমতা কমছে। পুকুর বুঁজিয়ে বহুতল নির্মাণ হচ্ছে। যত্রতত্র গভীর নলকূপ খনন করে জলস্তরকে নিচে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আবার মাটিতে অতিরিক্ত ফলনের জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার মাটির উর্বরতা শক্তি কমিয়ে দিচ্ছে।

ফলতঃ দূষিত বাতাস থেকে ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ও ক্যান্সারজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব ভীষণভাবে বেড়েছে। ত্বকের সমস্যা তৈরি করছে।

জলদূষণের ফলে সংক্রামিত রোগ বিশেষ করে ডায়েরিয়া, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস জাতীয় রোগ বাড়ছে। অতিরিক্ত রাসায়নিক সারজনিত খাদ্যশস্য থেকে ক্যান্সার জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে।

এদিকে যে তিনটি বড় সমস্যা তৈরি হচ্ছে Pollution, Poverty, Population; এর দিকে রাষ্ট্রের নজর কম। যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা আগামীদিনে সভ্যতাকে সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে; এই বিষয়গুলির উপর নজর একেবারেই নেই। ২০০০ সালে ভারতের জনসংখ্যা ১০০ কোটি থেকে ২০২২ সালে জনসংখ্যা ১৪০ কোটি অর্থাৎ বছরে প্রায় ২ কোটি করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা আগামি প্রজন্মের বিপদ তা মনে রাখতে হবে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, বাসস্থান, জলসম্পদ, ভূমির পরিমান নির্দিষ্ট। এত মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান কোথা থেকে আসবে ভাবছি না। মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানের অবস্থা খুবই খারাপ—ভারতও সেই পথে চলেছে। সাথে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধে প্রাকৃতিক পরিবেশ ভয়ংকর আকার নিচ্ছে। আসলে আমরা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নিজেদের চেহারা দেখি না। কেবলমাত্র রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকার জন্য যে কোনো ধরণের অমানবিক সিদ্ধান্ত নিই—আর মাঝে মাঝে কিছু দিবস পালন করে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনের ভড়ং দেখাই। আখেরে আমরা বোধহয় সভ্যতার সংকটের মুখোমুখি। Poverty, Pollution, Population নিয়ন্ত্রণে না আনলে এই গ্রহ ও আমরা সকলেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হব।

জলই জীবন-জলই মরণের কারণ

ডঃ সুমিত্রা খাঁ (পরিবেশবিদ)

জল এমনই এক নিত্য প্রয়োজনীয় জীবনদায়ী পদার্থ তাকে ছাড়া আমাদের জীবন চলে না। অথচ এই সভ্য সমাজে এই জলই নানাভাবে মরণের কারণ হয়ে উঠছে। ভাবিয়ে তুলছে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে। সাধারণ মানুষ থেকে বৈজ্ঞানিক মহলেও তোলপাড় চলছে। নানান গবেষণামূলক কাজও যেমন চলছে, তেমনি চলছে নানান সেমিনারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এই সচেতনতা বোধ জাগিয়ে তোলার কাজ।

বিভিন্ন গবেষণায় জানা গেছে পৃথিবীর জল দূষণ দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। বিভিন্ন গবেষণামূলক তথ্য থেকে জানা গেছে যে জল দূষণের প্রধান উৎসই—গৃহ বর্জ্য, শিল্প বর্জ্য, কৃষি বর্জ্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, এরাই পৃথিবীর জলকে ক্রমশই দূষিত করে তুলছে।

বিজ্ঞানের দৌলতে প্লাস্টিক বা পলিথিন নামক পদার্থটি সকলেরই মন কেড়েছে। হঠাৎ করে জিনিস কিনে যথারীতি প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে নিয়ে বাড়ি চলে আসা কত সহজ ব্যাপার! কিন্তু সকলের অজান্তে এই পলিথিনই কি বিপর্যয় ঘটায় তা এক অকল্পনীয় ব্যাপার, তবুও তা বাস্তব।

বর্তমানে এই পলিপ্যাকের জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে, এর কুফলও আজ পরিবেশবিদরা লক্ষ্য করেছেন। তাইতো আজ পাহাড়ের বুকে বিরাট বিজ্ঞপ্তি দেখা যায়—পলিপ্যাক অযথা ব্যবহার করবেন না, পাহাড়ের বুকে বিরাট জঞ্জাল সৃষ্টি করবেন না, পাহাড়ের বুককে পলিথিনের আবর্জনা থেকে মুক্ত রাখুন ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু পাহাড়ই বা কেন, নদী-নালার বুকেও এই পলিথিন বা পলিপ্যাকই ডেকে আনছে পরিবেশ দূষণ নামক দুশমনকে। নদীর জলে এই পলিথিন জমতে জমতে জলজ প্রাণীদের মধ্যে নানান সমস্যা দেখা দিচ্ছে। জেলেরা জাল ফেলে মাছের বদলে পাচ্ছেন পলিথিনের স্তূপ। দিনের পর দিন জমতে থাকা এই পলিপ্যাক নানান সমস্যার সৃষ্টি করছে।

এই প্লাস্টিক বা পলিপ্যাক সহজেই মাটিতে মেশে না, নষ্টও হতে চায় না। তাই চাষের জমিতে পলিপ্যাকের উপস্থিতি চাষেরও ক্ষতি করছে। আবার নর্দমার জলে ভেসে আসা এইসব পলিপ্যাক কোনো কোনো জায়গায় জমা হয়ে জল নিকাশির ব্যবস্থায় বহু বাধা সৃষ্টি করছে। অত্যাধিক বৃষ্টিতে জল নিকাশি ব্যবস্থার বাধা সৃষ্টি করে শহরের বুকে ডেকে আনে নানান দুর্ঘটনা। যে পলিথিন প্রথমে এসে মানুষের মনে এক বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছিল আজ সেই পলিথিন আবর্জনা হয়ে শহরের বুকে ঘটাচ্ছে নানান ঘটনা ও দুর্ঘটনা। আবার এই পলিপ্যাকের মধ্যে দিয়েই বৃষ্টির জল মাটিতে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে প্রাকৃতিক নিয়মে ভূ-গর্ভস্থ্য জলভান্ডার পূরণে বাধার সৃষ্টি হয়। ফলে কমে আসছে ভুগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার। যা ভবিষ্যৎ দিনের পরিবেশ সংকটের এক ভয়াবহ সংকেত। বর্তমানে এই সংকেতের আভাস বিভিন্ন জায়গায় দেখা দিয়েছে, যা ভাবিয়ে তুলছে পরিবেশবিদ এবং বৈজ্ঞানিক মহলকে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, বিসর্জনের বর্জ্যও জলকে দূষিত করে তোলে। যেকোন পুজো, তা সে দুর্গা পুজো, লক্ষ্মী পুজো, কালি পুজো যাই হোক না কেন প্রতিমা বিসর্জন যে জলাশয়ে হয় তা নদী, পুকুর যাই হোক না কেন বিসর্জনের বর্জ্য জলকে দূষিত করে।

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। তাই সারা বছর ধরেই নানা পুজো পার্বণে প্রতিমার বিসর্জন এবং তার সঙ্গেই আনুষ্ঠানিক ফুল, বেলপাতা বা অন্যান্য জিনিসপত্র বিভিন্ন জলাশয়ে বা পুকুরে কিংবা নদীতে ফেলা হয়। পরিবেশ বিজ্ঞানের মতে, এই বিসর্জনের ফলে প্রতিমার কাঠামো থেকে চুঁইয়ে পড়া রং, প্লাস্টিক ও নানান আবর্জনা জল ও তার পরিবেশকে বিশেষভাবে দূষিত করে তোলে। দূষিত পরিবেশ একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের ক্ষতি করে তেমনি ক্ষতি করে জলজ প্রাণীদেরও।

বর্তমানে সারা বিশ্বে জল দূষণের হাত থেকে রক্ষা পেতে সর্বত্রই জল বাঁচাতে আন্দোলন চলছে। সারা বিশ্বের মানুষ আজ বুঝেছে জল দূষিত হওয়ার কুফল কি। দূষিত জলের প্রভাবে একদিকে যেমন মানুষ রোগাক্রান্ত হচ্ছে, অপরদিকে প্রকৃতির বুকে নেমে আসছে উদ্ভিদকুল ও প্রাণীকুলের উপর নানান ক্ষতিকর প্রভাব। যার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ক্রমশই বিঘ্নিত হয়ে চলেছে।

মানুষের সচেতনতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা অঞ্চলে গড়ে উঠছে 'জল বাঁচাও কমিটি'। যাদের মূল ও প্রধান কাজই হলো—জল যাতে কোনভাবেই দূষিত না য়, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা। এখন বিভিন্ন অঞ্চলে, কী শহরে কী গ্রামে বেড়ে ওঠা এই কমিটিগুলি এবং তাদের দল সর্বতোভাবেই দলবদ্ধ হয়ে লক্ষ্য রেখে চলে—পুকুরের জল, জলার জল, কুয়ো বা পাতকুয়োর জল, নদীর জল যাতে কোনভাবেই দূষিত না হয়। প্রকৃতির বুকে দূষণ নামক দুশমনকে হঠানোর জন্য চলে ব্যাপক প্রচেষ্টা। সাধারণ মানুষও দিন দিন সচেতন হয়ে উঠছেন। তাঁরাও বুঝছেন—যে জলই জীবন, সে জলই যেন মরণের কারণ না হয়ে ওঠে।

নেতৃত্ব ও সংগঠন

সনৎ ভট্টাচার্য্য

শিশুসংগঠন বা অন্য যেকোন সামাজিক সংগঠন ভালোভাবে চালাতে গেলে এবং সংগঠনের উদ্দেশ্য আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে সফল করতে প্রয়োজন হয় সঠিক নেতৃত্ব। প্রদান করেন এক বা একাধিক নিষ্ঠাবান, শিক্ষিত ও আদর্শবান ব্যক্তি। তাঁর বা তাঁদের যৌথ নেতৃত্বে সংগঠন ফুলে ফলে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। সমাজে সুষ্ঠু পরিবেশ গঠনে সংগঠনের প্রভাব সুদূর প্রসারিত হয় আর ছোট-বড় সাধারণ মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। তাই নেতৃত্ব ও সংগঠন পরিচালনার জন্য স্বচ্ছ দৃষ্টি থাকা চাই। সেই বিষয়ে দৃকপাত করার জন্য এই লেখনীর অবতারণা।

নেতৃত্ব ও সংগঠন পরস্পর সম্পূরক। একটির অনুপস্থিতিতে অন্যটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। তবে সংগঠনের গুরুত্বই অধিক এবং এর মাধ্যমেই নেতৃত্ব গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। তাই সংগঠনের স্থূল অর্থটি আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। সম্যকরূপে বা প্রকৃষ্টভাবে, যেখানে লোকে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি করতে সমর্থ হয় অর্থাৎ যেখানে প্রকৃষ্টভাবে জীবনকে পূর্ণভাবে গঠন করবার সুযোগ পায় তাই প্রকৃত সংগঠন। অতএব কতকগুলি লোকের একত্র সমাবেশ ঘটলেই তা সংগঠনের রূপলাভ করে না। সংগঠনের মূলরূপ তখনই গ্রহণ করে যখন কিছু লোক একত্র হয়ে নিজেদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্য নিয়ে অবিরত কাজ করে যায়। আর এই কাজকে সফল করতে গেলেই দরকার নেতার যে তার সুষ্ঠু নেতৃত্বের দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই সুষ্ঠু নেতৃত্ব দেবার জন্য নেতার কতকগুলি বিশেষ গুণের সমাবেশ থাকা চাই।

ব্যক্তিত্ব হচ্ছে তার মধ্যে একটি বিশেষ গুণ যা একটি সংগঠনকে চালিত করবার পক্ষে নেতাকে বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে। এখন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। ব্যক্তিত্ব কতকগুলি একত্র জীবন ও তার কার্যাবলীর সমষ্টি, এ হচ্ছে মানসিক ও নৈতিক সম্পূর্ণতা।

আমরা জন্ম থেকেই ব্যক্তিত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করিনা। এই ব্যক্তিত্বটি আমাদের কার্যের দ্বারা অর্জন করতে হয়। আমরা কেবল নিজেদের প্রকাশ করব না, সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করব যাতে সকলের উন্নতি ঘটে। আত্মীয়তাবোধ এবং এইরূপ জীবনের আরও অনেক কার্যকরী বিষয় আছে যেগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যায়। ব্যক্তিত্ববান ব্যক্তির জীবনে থাকবে উচ্চ আশা ও লক্ষ্য এবং তারজন্য মনে মনে বিবেচনা করা ও তারজন্য সাফল্য লাভ করবার চেষ্টাই হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশের সঠিক পথ। উচ্চ আশা সম্পন্ন মনোভাব আমাদের ব্যক্তিত্বকে মার্জিত, উন্নত ও দৃঢ় করে তোলে।

সংগঠনের তাই ব্যক্তিত্বপূর্ণ নেতার একান্ত আবশ্যক। এই নেতাকে সবসময়ে চিন্তা করতে হবে যাদের নিয়ে সে সংগঠন তৈরি করতে যাচ্ছে, কি করে তাদের সর্বোত্তমভাবে সন্তুষ্টি বিধান করা যায়। তারা সত্যই কি চায়? তারা যাতে আনন্দ পায় এবং উন্নতি করতে পারে তার জন্যে সকল রকম সুবিধা দিতে হবে। এগুলি করতে হলে নেতাকে স্বেচ্ছাচারী হলে চলবে না। পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব সম্পর্ক রেখে গণতান্ত্রিক উপায়ে কাজ করে যেতে হবে। নেতার সবসময়েই সপ্রতিভ হওয়া প্রয়োজন, গোবেচারা হলে চলবে না। দলের সকলের প্রতি সমান যত্ন নিতে হবে এবং সমদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে। নিজের জাত্যাভিমান বা জ্ঞানাভিমান থাকলে চলবে না।

নেতা যে অঞ্চলের দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট তাঁর মর্যাদা ও সম্মানকে বড় করে তুলতে হবে। দলের স্বার্থে ব্যক্তিগত জীবনের অনেক সুখ-সুবিধা ত্যাগ করা আবশ্যক। অতীত জীবনে কোন ত্রুটি থাকলে বা বর্তমানে কোন অবাঞ্ছিত অভ্যাসে আসক্ত থাকলে সেগুলি আগে সংশোধন ও বর্জন করতে হবে। নেতার ব্যক্তিগত জীবন সমষ্টিগত জীবনের জন্য নবরূপায়ন দরকার। আর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন নেতার দৃঢ় নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া। সমাজে যে কাজগুলি অধিকাংশের সমর্থনীয় বা প্রশংসার যোগ্য নয়, সেগুলি বর্জন করে চলতে হবে।

নিজের দোষ-ত্রুটিগুলি সংশোধন করে উপরে কথিত গুণের চর্চা ও অধিকারী হওয়া নেতার একান্ত প্রয়োজন ও কর্তব্য। এর পরেও তাঁর বড় দায়িত্ব রয়েছে অন্যদের মধ্যে নেতৃত্বের প্রেরণা সৃষ্টি করা, তাকে বাঁচিয়ে রাখা ও তার বৃদ্ধি করা। সংগঠনকে দীর্ঘকাল বাঁচাতে হলে নেতার যোগ্য উত্তরাধিকার তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন, যারা নেতার অনুপস্থিতিতে সংগঠনের অগ্রগতির পতাকা সাফল্যের সঙ্গে বহন করে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

সংগঠনের কাজকর্ম :-

প্রথমেই সংগঠনের যে কাজ চলছে তা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চলছে না অবৈজ্ঞানিকভাবে চলছে তা স্থির করতে হবে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকলে সংগঠন বেশি দিন স্থায়ী হয় না। প্রথমেই দেখতে হবে যে শিশুসংগঠনে ছেলেমেয়েদের জন্য যে কর্মসূচীগুলো গ্রহণ করা হল তা সভ্যদের উপযোগী কিনা বা সেগুলি বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা অথবা সভ্যদের মানসিক ও শারীরিক উন্নতির সহায়ক কিনা। এগুলি, যথাযথ বিচার করার পর সংগঠনের দৈনন্দিন কর্মসূচি স্থির করতে হবে। সবপেয়েছির আসরের সংগঠনের ক্ষেত্রেও উপরের নিয়মগুলি একইভাবে প্রযোজ্য। শাখা আসরের সুবিধার জন্য আসরের অবশ্য করণীয় কতকগুলি কাজের অভিসঙ্কেত দেওয়া হল। তবে সকল কাজোর মধ্যে একটি মুখ্য উদ্দেশ্য থাকবে সেটি হচ্ছে—শিশু ও কিশোরদের মধ্যে দায়িত্ব বোধ, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, শৃঙ্খলাবোধ, সময়ানুবর্তিতা ও সমাজ চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 38

শাখা আসরের আদর্শ কর্মসূচী :-

১) সপ্তাহের বেশিদিন অন্ততঃ ১ ঘন্টা নানাবিধ শারীরচর্চা, খেলাধূলার ব্যবস্থা রাখা এবং সেগুলি সঠিকভাবে ও নিয়মানুযায়ী শেখানোর ব্যবস্থা করা, যাতে সোনারকাঠিদের ঐ সকল বিষয়ে উৎকর্ষতা বাড়ে, শরীর সুগঠিত হয়।

২) সুরুচিশীল ও সাংস্কৃতিক মনস্ক রূপে গড়ে তোলার জন্য আসরে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী অনাবিল নৃত্য-গীত, আবৃত্তি, নাটক প্রভৃতি শেখানোর ব্যবস্থা রাখা সপ্তাহের কর্মসূচীতে। সমবেতভাবে জাতীয় সঙ্গীত ও স্বদেশগীতি নিয়মিত শেখানো দরকার।

৩) সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সাহিত্যসভা, হাতে লেখা বা মুদ্রিত ম্যাগাজিন প্রকাশ এবং শিশু-কিশোর পাঠাগার স্থাপন আবশ্যক।

৪) সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে থাকবে ভারতীয় মনীষীদের জন্মদিন শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা এবং তাদের বাণী ও জীবন অনুসরণ করার চেষ্টা করা।

৫) স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সাপ্তাহিক কর্মসূচীতে হাতের কাজ, অঙ্কন প্রভৃতি থাকা প্রয়োজন। কিশোরদের উপযোগী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা। সম্ভব হলে কম্পিউটার শিক্ষা, ইলেকট্রিকের নানাবিধ কাজ, রেডিও, টি.ভি. সারানো প্রভৃতি কাজ শেখানো যেতে পারে।

৬) সমাজ সেবামূলক কাজের মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবিধান শিক্ষা, মেয়েদের গৃহবিজ্ঞান ও শুশ্রূষা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। সঙ্গে স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন প্রভৃতি কাজে অংশ নেওয়া।

৭) সবশেষে যে সকল কর্মী আসরের শিশু ও কিশোরদের পরিচালনা করবে তাদের শিশু ও কিশোরদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানবার ব্যবস্থা করা নেতার কর্তব্য। এছাড়া শিশু মনস্তত্ত্ব, শিশুস্বাস্থ্য, শিশু শিক্ষা সম্বন্ধীয় বক্তৃতা আলোচনা ও পুস্তকাদি পাঠের ব্যবস্থা করা দরকার।

উপরের কর্মসূচীকে ভিত্তি করে এবং মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সচেতনভাবে যদি আসর সংগঠনের কাজ চালানো যায় তাহলে আসরের স্থায়িত্ব দৃঢ় হবে ও তার কার্যকারিতা পূর্ণ হবে, এবং আসর ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। তবে মনে রাখতে হবে আসর হবে আনন্দ নিকেতন। এখানে শিশু ও কিশোরদের গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে মনের আনন্দ যোগাতে হবে যাতে তাদের কাছে আসর আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হয়।

(পুনর্মুদ্রণ)

স্বপনবুড়োর শুভেচ্ছা

জীবন কাটে শিশুর সাথে পথ যে চলায়
অনেক কথা শোনায় তারা, অনেক বলায়।
তাদের লাগি নিত্য গাঁথি ছড়ায় গানে —
তাই শিশুদল ডাক দিয়েছে সরল প্রাণে।
ওদের সাথে পথ চলাতে খুশীর দোলা
সন্ধ্যা সকাল তারাই সাথী আপন ভোলা।
চলার পথে ফুটছে অনেক রঙীন কুসুম
ওদের কাছে গল্প বলে নাই চোখে ঘুম।
সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে — বৃষ্টি নামে
ওদের সাথে পথ চলা মোর আর না থামে।
পথের ধারে বনের বিহগ শোনায় গীতি —
শিশুর জগৎ জানায় আমায় মধুর প্রীতি।
আজ জীবনের সন্ধ্যা বেলায় দেখছি চেয়ে —
ভালোবাসায় শিশু হাজার রয় যে ছেয়ে।
তাদের শিরে ঢালছি আমার আশিষ ধারা
মোর গগনে ফোটায় শিশু জীবন তারা।।

অমৃতলোকের সন্ধানে

শ্রী মাষ্টারমশাই

শিশু কে না ভালোবাসে? সকলেই ভালবাসে। সে ভালবাসা প্রীতির, প্রেমের, স্নেহের ভালবাসা। এতে কিন্তু শিশুর অকল্যাণ করা হয়। শিশুকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, দিতে হবে সঙ্গ। নইলে অকালে তারা শুকিয়ে যাবে। থাকবে শুধু নিরাশার অন্তর্দ্বন্দ্ব।

আমি ভালবাসি শিশু। নারী-পুরুষ অভেদ তত্ত্বে। শিশুর হাসি, শিশুর আধো বুলি অমৃততুল্য। শিশুর অপলক দৃষ্টি যেন নব নব সৃষ্টির অতলস্পর্শী সুগভীর ঐতিহ্যপূর্ণ আশার আলো। যত দেখি ততই মনে হয় আরও কিছু আছে সেই দৃষ্টির গভীরে, ঘন কুয়াশার মত অজ্ঞতার তমসার জালের অন্তরালে। তার সেই গভীরে যেতে হবে, ধীরে ধীরে, অতি ধীরে, পর্যায়ক্রমে জ্বালাতে হবে সেখানে জ্ঞানের দিশারি দশ দিশি শিখা যুক্ত সত্য ন্যায়ের জ্ঞানদীপ। সে একদিন করবে বিশ্বকে চমৎকৃত, বিশ্বে সত্যের রশ্মি রঞ্জনরশ্মি রূপে প্রকাশ করবে সত্য ন্যায়ের অপ্রতিহত রশ্মিমালা। যে আলোর স্পর্শ পেয়ে অন্যায়, অবিচার, অধর্মের, অসত্যের কালো যবনিকা হবে অপসারিত। শান্তি, স্বস্তি, স্বাহা, বিস্তৃতি লাভ করবে পৃথিবীর সর্বস্তরে। বিশ্ববাসী বিস্ময়ে, আনন্দে, উচ্ছ্বাসে, উদ্বেলিত হয়ে উঠবে মহাসাগরের উর্মিমালার মত। এর জন্য দরকার সুদক্ষ, সুচিন্তিত, সুধী কারিগর যারা বিশ্বশিশু-কারখানায় উৎপাদন করবে সত্যালোক জাত সুমিষ্ট, সুবাসিত, সুস্বাদু, সুন্দর সত্য বিজড়িত অমৃতফল।

সেই সুদক্ষ কারিগর কারা? অমৃত সন্তান যারা। মানুষ মাত্রেই সেই অমৃতের সন্তান। তাই তারা সচেষ্ট হলে, তাদের সদিচ্ছায় তারা কি না করতে পারে। তারা মৃত্যুঞ্জয়ীর সন্তান, তারাও মৃতুঞ্জয় হতে পারে সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে বর্তমান শিশু সমাজে সঙ্গদান করে সুনাগরিক গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করলে। অন্যথায় পরবর্তী প্রজন্ম অমানিশার গভীর অন্ধকারের মত অবক্ষয়ের বেড়াজালে জড়িয়ে হতাশায় হতবুদ্ধি হয়ে বাজাবে ধ্বংসের বিষাণ।

এরূপ সমাজকল্যাণ, সেবামূলক ‘শিশু কিশোর সংগঠন’গুলির মধ্যে ‘সবপেয়েছির আসর’ একটি। ‘সবপেয়েছির আসর’ সবারে করে আবাহন। যার যা সামর্থ্য আছে তাই দিয়েই গড়ে তুলতে হবে ভাবী কালের সুনাগরিকের দল সুফল প্রাপ্তির আশায়। যার ফলে নূতন প্রজন্ম পাবে অমৃতের আস্বাদ। অমৃতের সন্তান অমৃতের আস্বাদ লাভ করে মর্তের অমরাবতীতে ফোটাবে সুন্দর শুভ্র ফুলগুলি স্বর্গের নন্দনকাননের মত। এই নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ, নিস্পৃহ শিশুদের দিকে একটু সাহায্যের হাত বাড়ালে এরা ধরে নেবে হাত লতা-গুল্মের মত এবং আগামী দিনে বসাবে মর্ত্যে নন্দনের হাট।

সকলেরই হওয়া উচিত শিশু ধ্যান, শিশু জ্ঞান, শিশু নন্দন কাননে পারিজাত কুসুম। তাদের অসহায় দৃষ্টির প্রতি সহায়তার হাত বাড়ালে তারা পাবে আশা ভরসার আশ্রয়স্থল। বড় হওয়ার এই প্রাথমিক সোপান। আমি চলেছি সেই অমৃত লোকের সন্ধানে, শিশুদের জীবন সমুদ্র রণাঙ্গনে। আসুন সবে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।

(পুনর্মুদ্রণ)

শোনো সবাই শোনো

অধ্যাপক বুদ্ধদেব চক্রবর্তী (দাদাভাই)

তখনকার দিনে (১৯৪৫) “যুগান্তর” বলে একটি খবরের কাগজ ছিল। রোজ প্রকাশিত হত। সেই কাগজের মঙ্গলবারে সব শেষের পাতাটা ছিল ছোটদের জন্য নির্দিষ্ট। পাতাটির নাম ছিল “ছোটোদের পাততাড়ি”। এই পাতাটি পরিচালনা করতেন ছদ্মনামে একজন মহৎ গুণী ব্যক্তি। তাঁর আসল নাম ছিল অখিলবন্ধু নিয়োগী। আর ছোটদের পাত্‌তাড়ি পরিচালনা করতেন “স্বপনবুড়ো” এই নামে।

বেশ কিছুদিন ছোটদের পাত্‌তাড়ি চলবার পর স্বপনবুড়োর মনে হল শুধু পাতার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে একটি সংগঠনের সূচনা করা যাক। তখনকার বিখ্যাত জনপ্রিয় ছোটদের সাহিত্য জগতের আদরনীয় কবি সুনির্মল বসুর সঙ্গে পরামর্শ করে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা “সবপেয়েছির দেশ”-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই সংগঠনের নাম ঠিক করলেন “সবপেয়েছির আসর”।

স্বপনবুড়ো সবপেয়েছির আসর প্রতিষ্ঠা করলেন। আর আমরা একে প্রতিষ্ঠান করে গড়ে তুললাম। সবপেয়েছির আসরের সাংগঠনিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা কার্যক্রম সবকিছু আমরা অর্থাৎ যারা কেন্দ্রীয় কর্মীর দল ছিলাম তারা গড়ে তুললাম। কত কর্মীর অবদানে এই সংগঠন সুসমৃদ্ধ হয়েছে তার কোন লেখাজোখা হিসেব নেই। আর সেই হিসাব পেশ করা আজকে আমার এই লেখার উদ্দেশ্য নয়।

আমাদের এই প্রাণের প্রতিষ্ঠানকে এখনও পর্যন্ত কর্মীর দল নিজেদেরকে উজাড় করে দিয়ে বড়-আরও বড়-অনেক বড় করবার প্রয়াস বজায় রাখছেন। কর্মীদের ত্যাগের, সহ্যের, দানের তুলনা নেই। এখনও যারা নানা শাখায়, অঞ্চলে, জেলায়, কেন্দ্রে যেভাবেই যুক্ত আছি, তারা কিন্তু কেউই এখানে চাকরি করি না। কিছু লাভ করার জন্য, গুছিয়ে নেবার জন্য, আমরা আসিনি। আমরা বড়রা এখানে এসেছি ছোটদের ভরিয়ে

দিতে, আমাদের সব দিতে এসেছি আমরা, পেতে কিংবা নিতে নয়।

এমন নাম হল কেন, অনেকেই জানতে চান। তাঁদের জন্য বলতে হয় যে এই নামকরণ করেছিলেন প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং স্বপনবুড়ো। নামের তাৎপর্য হল—এমন একটি সংগঠন আমরা গড়ে তুলব যেখানে ছোটরা এসে সব কিছু পাবে। এই সব কি? স্কুলে পড়াশোনা পাই, মুক্তি পাই না। মনটা থাকে বাঁধা। বাড়িতে, খাওয়া-দাওয়া পাই। কিন্তু আনন্দ পাই না। কারণ বড্ড শাসন। মনটা থাকে ভীত। আমি নিজেকে মেলে ধরার জন্য, মনের আনন্দে গাইবার জন্য, নাচবার জন্য, ছুটোছুটি করবার জন্য, অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করে নিজের মনটাকে মেলে দিয়ে বড় আনন্দের সাথে মজার সাথে মিলিয়ে নেবার জন্য একটু স্থান পাই, সময় পাই। এই জিনিসটাই আমরা ছোটদের পূরণ করে দিতে চাই। ছোটরা অনেককিছু পেলেও কিছু তাদের অপূরণ থাকে। সেইটুকু সবপেয়েছির আসর পূরণ করে দেয়। সেইটিই সব।

তুমি যেখান থেকে যা পাও, সম্পূর্ণ হয় না সেই পাওয়া থেকে যদি আনন্দ না পাও। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে এসে ছোটরা আনন্দ পাবে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে পঁয়ষট্টি বছর ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি। বিদ্যালয়ের অপূরণটুকু এখানে পূর্ণ হবে, বাড়ির অভাব এখানে এসে পূরণ হবে—এই দুইয়ের পরিপূরক রূপে সবপেয়েছির আসরের অবস্থান।

প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম ঠিকমত চালনা করবার জন্য বিভিন্ন পদ, অধিকার, ক্ষমতা, দায়িত্ব এইসব নির্ণয় করে দিতে হয়। মোটামুটি স্বপনবুড়ো এগুলি আরম্ভ করে দিয়েছিলেন—নামও দিয়েছিলেন ভেবেচিন্তে। সবপেয়েছির আসরের প্রশাসনিক, সাংগঠনিক স্তরের নামগুলি সব 'স' দিয়ে। সোনারকাঠি, যারা সাধারণ সভ্য-সভ্যা ভাইবোন। সত্যসেবী—ভাইবোনদের মধ্যে যোগ্যতায় উত্তীর্ণ ও অনুমোদিত ভাবী কর্ণধার। সংঘমিত্র—বয়স্ক ব্যক্তি যিনি অভিভাবক বা তত্ত্বাধায়করূপে কর্তব্য পালন করবেন।

বেশ কিছুকাল সবপেয়েছির আসর গড়ে ওঠবার পর এবং বাড়বাড়ন্ত হবার পর নিয়মশৃঙ্খলা, আচরণবিধি, ক্ষমতার সীমা রেখা নির্ধারণ, কর্তব্যের রূপরেখা নির্ণয় ইত্যাদি ব্যাপারে মনোনিবেশ করা হল। তখন একসময় ঠিক হল যে সোনারকাঠি সভ্য / সভ্যাদের ভিতর থেকে যোগ্য প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন সম্ভাব্য ভাই বা বোনকে বেছে নিতে হবে। আর তাই জন্যই ১৯৫২ সালে প্রচলিত হল "সত্যসেবী পদাধিকার পরীক্ষা"। সংক্ষেপে সত্যসেবী পরীক্ষা"।

আজও অবধি এই পরীক্ষা চালু আছে। আর পাঁচটা স্কুলের কিংবা ক্লাবের বা সাধারণ ব্যায়াম সমিতির মত নয় আমাদের সব পেয়েছির আসর। তাই আমাদের পরীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটিও একটু অন্যরকম। 'সত্যসেবী' মানেটা বুঝতে হবে। যে সর্বদা সর্বত্র সর্বপ্রকারে সত্যের সেবা করবে। এটার মানে এমন নয় যে সেবা করবে মানে হাত-পা টিপে দেবে, তামাক সেজে দেবে, পাখার বাতাস করবে। সত্যসেবী মানে হল, আমাদের সব পেয়েছির আসরের যেটি শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য ধন অর্থাৎ 'আনন্দ' তাকে লাভ করবার সচেষ্ট সক্রিয় সতর্ক থাকবে। আনন্দ অতি উচ্চস্তরের বস্তু। সত্যিকারের আনন্দ লাভ করবার জন্য অনেক সময় অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়।

'সব পেয়েছির আসর'কে আমরা সংক্ষেপে উচ্চারণ করি স-পে-আ বলে। আর আমাদের আসরের ব্যাপারে কোন কথা বলতে গেলে আলোচনা করতে গেলে সম্বোধন করতে হলে অবশ্যই আমরা বলি—'শুভম্'-স-পে-আ। অর্থাৎ যে বলছে, যাকে বলছে, উভয়ের শুভ বা মঙ্গল বা ভালো হোক। আর যা কিছু ভাল, মঙ্গল বা শুভ—তাই-ই আনন্দ। আমাদেরও আরম্ভ হয় শুভম্ দিয়ে আর সম্পূর্ণ হয় আনন্দ দিয়ে।

স-পে-আ কথাটিকে সত্যসেবীরা খুব ভাল করে বুঝে নিয়ে অন্যান্য ভাইবোনেদের বুঝিয়ে দেবে। সত্যসেবীরা হল বাইরে খেলার দলের ক্যাপ্টেনের মত। ভিতরে দায়িত্বশীল ভিত্তির মত। একজন সত্যসেবী যত ভাল, যত যোগ্য, যত তৎপর হয়ে উঠবে সেই আসর তত উন্নতি করবে।

দেখেছো তো একটি ছোট্ট বীজ প্রথমে কেমন থাকে। বুঝতেই পারা যায় না সেটা কি হতে পারে! তারপরে জল-রোদ-হাওয়া পেয়ে অঙ্কুর বেরোয় বীজ থেকে। ঐ অঙ্কুরই ক্রমে বিস্তারিত হয়ে বেড়ে উঠে পাতা, ডগা, ডাল, ফুল, ফল কত কিছু হয়। মূল হল বীজ আর তারপর অঙ্কুর। সত্যসেবী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে যোগ্য হয় সেই ভাই বা বোন ভাবী কর্ণধার হবার জন্য। সত্যসেবী হল আমাদের স-পে-আ বৃক্ষের অঙ্কুর। ধীরে ধীরে এই অঙ্কুর বিরাট পৃথিবীর দিকে, মহান আকাশের দিকে অফুরন্ত বাতাসের দিকে নিজেকে মেলে ধরবে। সত্যসেবীদের কর্মসাধনায়, আচারে, ব্যবহারে, নিপুণতায় ভাইবোনেরা ভাল হয়ে, সুন্দর হয়ে, পূর্ণ হয়ে গড়ে উঠবে। সত্যসেবী হওয়ার দায়িত্ব কর্তব্য সর্বদা পালন করতে হবে। সত্যসেবীরাই আমাদের আগামি দিনের আশা, স্বপ্ন, সম্ভাবনা—একথা মনে রেখেই সবাইকে এগোতে হবে।

প্রত্যেক বছর বেশ কিছু সংখ্যক ভাইবোন সত্যসেবী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পুরস্কার পায়। পদক পায়। প্রশস্তিকা পায়। কিন্তু মনে রেখো ঐ একটা পরীক্ষায় পাশ করাটাই সব পেয়েছির আসরের চরম কাজ নয়। পরীক্ষার প্রশস্তিকা হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাছ থেকে প্রত্যাশা বেড়ে গেল। পাশ করার মুহূর্ত থেকে তুমি চিরদিনের জন্য সত্যের সুন্দরের আনন্দের সেবা করবার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেলে। অন্য আর সব সাধারণ ভাই বোন সোনারকাঠি থেকে তোমার মান একটু উঁচু হল বৈকি। তোমাকে তার উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে, থাকতে হবে। সেটাই সবচেয়ে জরুরি।

একজন সত্যসেবী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভাই বা বোন ক্রমে একদিন মূলকেন্দ্রের সর্বোচ্চ পদ অলঙ্কৃত করতে পারে। তার ভিতরে যে অঙ্কুরের শক্তি আর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তাকে প্রকাশ করতে হবে। তাই সবপেয়েছির আসরের সকল কাজকর্ম শিক্ষণ, শিবির, সম্মেলন, আনন্দানুষ্ঠানের সঙ্গে গভীরভাবে দায়িত্বশীলভাবে জড়িয়ে থাকতে হবে।

আমরা যারা বড়ো হয়ে আছি, বুড়ো হয়ে গেছি তারা কিন্তু ঐ সত্যসেবীদের দিকে তাকিয়ে আছি। সত্যসেবীরাই একদিন প্রমাণ করে দেবে তারাই আসরের ভবিষ্যৎ, তারাই ভরসা, তারাই প্রত্যাশা। তারা সবকিছু পাবার সাধনায় নিষ্ঠা নিয়ে থাকবে ছোটদের বড় হয়ে উঠতে সহায়তা করবে আর অন্তরে অন্তরে অনুভব করবে এবং সবাইকে বলবে স-পে-আ মানে কিনা সব পেলেই আনন্দ। আমরা সেই আনন্দ পাই, পেয়ে সেই আনন্দ সবাইকে বিলিয়ে দিয়ে আরও আরও অনেক আনন্দ পাই। শুভম্ স-পে-আ।

(পুনর্মুদ্রণ)

নেতাজী কন্যা অনিতা বসু ও সবপেয়েছির আসর

গণেশ ঘোষ

(উপদেষ্টা, স.পে.আ.)

১৯৫২ সালে ভিয়েনা শহরে "আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনে" ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক ও শিশুসংগঠক স্বপনবুড়ো (অখিল নিয়োগী) ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। সেইসময় একদিন স্বপনবুড়ো অনিতাদের বাড়িতে কাটিয়ে আসেন। সেখানে অষ্ট্রিয়ান তনয়া এমিলিএ ও তার মা ও মেয়ে অনিতার সঙ্গে সারাদিন নানা গল্প করেন। তখন অনিতার বয়স ৯ বছর (অনিতার জন্ম ২৯শে নভেম্বর ১৯৪২)। ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের নানাবিধ কাজে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছিলেন এই এমিলিয়ে।*

স্বপনবুড়ো সেই সময় অনিতাদের বাড়িতে তার মায়ের একটা সুন্দর গ্রন্থাগারও ভিয়েনায় দেখে এসেছিলেন। অনিতা ও তার মাকে কয়েকটি বইও দিয়ে এসেছিলেন। দীর্ঘদিন পর ১৯৬১ সালে অনিতা কলকাতায় এলে, স্বপনবুড়ো ১ নং উডবার্ণ পার্কে শরৎ বসুর বাড়িতে গিয়েছিলেন।

যুগান্তরের পাত্‌তাড়ির পাতাতে প্রকাশিত—২৪শে জানুয়ারি ১৯৬১ স্বপনবুড়োর কথায়—

"১৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার শীতের সকালে অনিতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। অবশ্য আগে থেকে খবর দেওয়া ছিল। প্রথমেই দেখা এই বাড়ির বন্ধু শ্রী শিশির বসুর স্ত্রী শ্রীমতি কৃষ্ণা বসুর সঙ্গে। ইনি আমেরিকা, ইউরোপ বিভিন্ন দেশ ঘুরে এসেছেন এবং তাঁর লেখা যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে এই বাড়ির মেয়েরা ও বাচ্চারা আসর জাঁকিয়ে তুললেন। নানারকম গল্প চলতে থাকল। অতঃপর এলো অনিতা (তৎকালীন বয়স ১৮)। হালকা রঙের শাড়ি পরণে। আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আমায় নিশ্চই ভুলে যাও নি। মৃদু হাসির সঙ্গে সে জানায়, না ভুলিনি। অনিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার মা ও দিদিমা কেমন আছেন? অনিতার চোখ দুটিতে একটু আশঙ্কার ছায়া পড়ল। জবাব দিল, কিছুদিন ধরে ওদের শরীর ভালো যাচ্ছে না। কেবলই ভুগছেন। খবর শুনে দুঃখিত হলাম। কেননা সেবার ওদের দুজনের কাছ থেকে যে আন্তরিকতা পেয়েছিলাম, সেকথা ভোলবার নয়। অনিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের দেশ বিশেষ করে কলকাতা কেমন লাগছে? ও জানালো, কলকাতা তার খুব সুন্দর লেগেছে। আমি কৌতুক করে টিপ্পনী কাটলাম, গ্রীষ্মকালে থাকলে মজাটা টের পেতে। অনিতা হাসতে লাগল। আমি একটা বই উপহার দিয়েছিলাম। বইটি দেখে সে হাসতে লাগল। আমি "সবপেয়েছির আসর"-এর কথা তাকে জানালাম। ঐ আসরের ছেলেমেয়েরা যে একদিন তার সাথে মিলতে চায় সেকথা বললাম। সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দিলাম যে অনিতাও কিন্তু "সবপেয়েছির আসর"—এর সভ্যা। সে আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিল আর জানালো, নেতাজী জন্মোৎসব সপ্তাহে সে খুব ছোটাছুটিতে থাকবে। তারপরে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে একদিন আসরে আসবে। সেটা তার পক্ষে খুবই আনন্দের ব্যাপার হবে।

অনিতাকে তখন নেতাজী জন্মোৎসবে ছোটদের পাত্‌তাড়ির বিশেষ সংবাদের কথা বললাম। আর সেই সঙ্গে তাকে আসরের সোনারকাঠিদের উদ্দেশ্যে একটি শুভেচ্ছাবাণী দিতে অনুরোধ করলাম। বাংলায় তো হবেই না তাই অনিতা ইংরাজীতে শুভেচ্ছা বাণী লিখে দিলো।

Calcutta 23.01.1961

My dear little friends, it is a great pleasure for me that I can celebrate together with all of you today. I wish you all the best for your future life. May India be as proud of you as she is of Netaji now.

Jai Hind.

Anita Bose

আমি ওকে আমার দুখানি ছেলেভোলানো বই উপহার দিলাম। আর বললাম, বাংলা ভাষা যখন শিখবে—তখন আমার এই দুখানি বই পড়ো। সে হাসতে হাসতে উত্তর দিলো, বাংলা কিন্তু খুব শক্ত ভাষা। অনিতার মারফৎ মায়ের জন্য দিলাম দেবী বীণাপাণির একটি ছবি। বললাম, "Goddess of Learning"— এ ছবিটি তোমার মায়ের গ্রন্থাগারের জন্য। সাগ্রহে অনিতা সেটি গ্রহণ করল। ওর মায়ের একটি সুন্দর গ্রন্থাগার আছে। আমি সেটা ভিয়েনায় জেনেছিলাম। অনিতাকে প্রশ্ন করলাম, তোমার হাতে আঁকা কোন ছবি আছে? পাত্‌তাড়িতে ছাপলে ছোটরা খুব খুশি হবে। ও হেসে উত্তর দিল, ক্লাসে আমায় ছবি আঁকতে দিলে আমি আমার বন্ধুদের দিয়ে সেটা আঁকিয়ে নিই। এমনই আমি নামকরা শিল্পী। খবর নিয়ে জানা গেল ইতিমধ্যে অনিতার একবার বোম্বাই যাবার ইচ্ছা আছে। কোহিমার দিকেও যাবার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু দিন ঠিক হয়নি। সেই ছোট্ট অনিতা—নয় বছরের মেয়ে যে ভিয়েতনামে আমার কোলে উঠেছিল—সে আজ বড় হয়ে তার মাতৃভূমি দেখতে এসেছে, সেটা যে আমার কাছে কত বড় আনন্দের, একথা তাকে জানালাম। বেলা বেড়ে

---

* ইংরাজী জানা সহকারিণী হিসাবে তিনি নেতাজীর সঙ্গে কাজ করতে এসেছিলেন। সুভাষচন্দ্র তখন "Indian Struggle" বইটি লিখছিলেন। ঐ বইয়ের ভূমিকায় ২৯শে নভেম্বর ১৯৩৪ তারিখে তিনি নাম করে একজনকেই ধন্যবাদ দিয়েছেন—ফ্রয়েলাইন এমিলিয়ে শেংকল। বলতে গেলে স্বামী বিবেকানন্দের স্টেনোগ্রাফার মি. গডউইন যার মাধ্যমে আমরা বিবেকানন্দের বিদেশের বক্তৃতা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য জানতে পারি, তেমনই এই ভিয়েনাবাসিনী এমিলিয়ে শেংকলের মাধ্যমে নেতাজীর প্রচুর লেখার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হওয়া সম্ভব হয়েছে।

যাচ্ছে দেখে অনিতা ও সবাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রৌদ্রজ্জ্বল রাস্তায় নেমে পড়লাম।"

এদিকে ৩১শে জানুয়ারি পাত্তাড়ির পাতায় ঘোষণা বেরোল—

"সবপেয়েছির আসরে নেতাজী কন্যা অনিতা"

আগামি ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিকাল চারটায় শোভাবাজার রাজবাড়ির সবুজসাথী আসরের প্রাঙ্গণে নেতাজী কন্যা অনিতা আসরের সোনারকাঠিদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। প্রত্যেক আসরকে সোয়া তিনটার মধ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য জানানো হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে শুধু ছোটদের প্রবেশাধিকার থাকবে।

এই সময় নেতাজীকন্যার কলকাতা আগমন ও নেতাজী অনুষ্ঠানে তাঁর যোগদান করা নিয়ে বাঙলায় খুব হৈচৈ চলছে। যুদ্ধ অপরাধী বলে নেতাজী আত্মপ্রকাশ করতে পারছেন না, এই নিয়েও খুব উত্তেজনা চলছে। এর নিরসন করতে কলকাতার ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার ২১শে জানুয়ারি ১৯৬১, শনিবার 'যুগান্তর' পত্রিকায় একটি চাঞ্চল্যকর বিবৃতি দিলেন—

"নেতাজীর নাম যুদ্ধ অপরাধীদের তালিকায় নাই"।

"সুভাষচন্দ্র বসুর নাম ব্রিটেনের যুদ্ধ অপরাধীর তালিকায় আছে বলিয়া সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে। আমাকে এই কথা ঘোষণা করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে সুভাষচন্দ্র বসুর নাম এরূপ কোন তালিকায় নাই এবং কখনো ছিল না। সুতরাং এরূপ কোন তালিকা হইতে তাঁর নাম অপসারণের কোন প্রশ্নই ওঠে না।"

কলকাতায় মহাধূমধামের সঙ্গে নেতাজী জন্মোৎসব পালিত হতে চলেছে। ২৪শে জানুয়ারি মঙ্গলবার ১৯৬১ 'যুগান্তর' পত্রিকা থেকে নেতাজী জন্মোৎসবের বিবরণে হেড লাইনে জানা গেল—

"স্বাধীন ভারতবাসীর বর্তমান দুর্দশায় নেতাজী নিশ্চই ক্ষুণ্ণ হইতেন"—পিতার জন্মদিনে ময়দানে জনসভায় অনিতার মন্তব্য।

তাঁহার সুযোগ্যা দুহিতা কুমারী অনিতা বসু ময়দানে সমাবেশে সেই দুরাগত অতিপ্রিয় কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন, "লক্ষ লক্ষ ভারতীয় আজও যে স্থির রইয়াছে সে দৃশ্য তাহার পিতার দুঃসহ চিত্ত পীড়ার কারণ ইহত।"

পূর্বনির্দ্ধারিত দিনে (৪ঠা ফেব্রুয়ারী, '৬১) অনিতা ও তার বৌদি কৃষ্ণা বোস ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাজির হলেন "সবপেয়েছির আসর"-এর অনুষ্ঠান শোভাবাজার রাজবাড়িতে। অনিতার পৌঁছোবার আগে থেকেই শোভাবাজার রাজবাড়ি প্রাঙ্গণ ছোটখাটো ছেলেমেয়েতে একেবারে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জানাব আবদুর সাত্তার যিনি নেতাজীর অন্যতম সহকর্মী ছিলেন। শিল্পী রেবতীভূষণ অনিতার একটি সুন্দর স্কেচ আঁকেন এবং তাতে অনিতা সাক্ষর দেন। আসরের এক ভাস্কর বাসুদেব পাল অনিতার একটি মাটির মূর্তি খুব অল্প সময়ে বানিয়ে উপহার দেন। ইংরাজিতে কবিতা শোনান আসরের সভ্যা মিস. এড্রো বার্ণাড। রক্তরবি আসরের শুভ্রা চক্রবর্তী প্লাস্টিক স্কেচ দেখিয়ে সকলকে খুশি করেন। মূলকেন্দ্র থেকে নটরাজের সুন্দর মূর্তি ও স্কাব ছাড়াও বিভিন্ন আসর থেকে বিভিন্ন উপহার প্রদান করা হয় এবং "সবপেয়েছির আসর"-এর সোনারকাঠির দল একটি মানপত্র প্রদান করে—

মানপত্র

"অনিতার উদ্দেশ্যে"

সে রূপকথার কাহিনী আমরা আজও ভুলিনি বোন
ভারত জানিত সে রূপকাহিনী আজ তুই একা শোন্।
বিশাল সে দেশে সোনার সে ভূমি মণিমাণিক্যে গড়া
পাহাড়ে নদীতে গুহা দেবালয়ে ছিল সোনা ঘড়া ঘড়া।
কোন্ যাদুকর গোপনে আসিয়া পাষাণ করিল সবে
কেহ নাহি জানে সে যে পাষাণ জীবন লঘিবে কবে
জাদুকর আসি চুরি করে নেয় মণিমাণিক্য সোনা
পরশপাথর হীরা ও পান্না নাহি যায় আর গোনা।
পাষাণপুরীতে সকলে ঘুমায় তপন নাহিকো ওঠে—
অমাবস্যার আঁধার নিশিথে যাদুকর সম লোটে।
কানন শুকিয়ে হল যে কয়লা শুকসারি দোহে কাঁদে
সুশীতল করি হল পঙ্কিল কেহ নাহি মন বাঁধে
সেই আলোহীন কৃষ্ণরাতে রাজার কুমার জাগে
বলে ডাক দিয়া, "ঘুমায়ও না এসো সবে লাখে লাখে
মোরে দাও খুন, আমি এসে দেব সবাকার স্বাধীনতা
গোপনে কাননে ডাকিল বেহগ জেগে ওঠে তৃণলতা।
রাজার কুমার উধাও হইল সঞ্জীবনির তরে
পাষাণ পুরীতে জাগে কানাকানি ওঠে গান ঘরে ঘরে
সারা দেশবাসী আকুল নয়নে অতন্দ্র রাত জাগে
কোন শুভক্ষণে তাদের নয়নে রবির কিরণ লাগে।

* ডানদিকের অংশ—

আজও ফেরে নাই রাজার কুমার কেঁদে মরে সারা দেশ
আকুল নয়নে পথ পানে চায় কোথা সে বীরের বেশ
কাঁপে অরণ্য-পর্বত-নদী কাঁদে শুকসারি
সারা দেশবাসী উদ্বেল হল ক্রন্দনে খানাখানি।
এমন সময় তুমি আসিলে গো জোছনার মত মেয়ে
হিমালয় থেকে ভারতসাগর আছে তোমাপানে চেয়ে
রাজার কুমার নিজে ফেরে নাই পাঠালো মুক্তাসম
তোমারে অনিতা, কুমারের মেয়ে তুমি যে গো অনুপম।
মোরা আসরের সোনারকাঠিরা পুলকিত তোমা পেয়ে
রাজকুমারের মুখের লাবণী এনেছো কন্যা চেয়ে।
পিতৃভূমিতে নতুন করিয়া বাঁধো তুমি নয়া ঘর
সোনারকাঠিরা তোমার তব জেনে কহে নাহি পর।

শোভাবাজার রাজবাড়ি
৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

ইতি—
সবপেয়েছির আসরের
সোনারকাঠির দল
(পুনর্মুদ্রণ)

একটু পা চালিয়ে ভাই

সোমেশ ভূঁইঞা

(প্রাক্তণ মূলসত্যসেবী)

'বিংশ শতাব্দিতে মানুষের শোকের আয়ু বড় জোর এক বছর' 'জেলখানার চিঠি' কবিতায় কবি নাজিম হিক্‌মত এমন একটি স্মরণীয় লাইন লিখেছিলেন। গত কিংবা এই শতকের গোড়ায় কোনও কবি বা সমাজবিজ্ঞানী মানুষের শোকের আয়ু বা স্মৃতির পরমায়ু নিয়ে কোনও কাব্যগাঁথা বা মন্তব্য করেছেন বলে জানা নেই। সম্ভবত করেন নি। কবিরা হয়তো কল্পনা করতে পারেন, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীদের পক্ষে কাজটা কঠিন বৈকি!

এই কঠিন সময়ে, মানুষের সম্পর্কের বাঁধনগুলোই ক্রমশঃ আলগা হয়ে যাচ্ছে। তার ব্যাপক প্রভাব সমাজ-সংসার সর্বত্র। কঠিন-কঠোরের সংঘাত জীবনের কোমল অনুভব দিনকে দিন কমছে। পরিবার অণু থেকে পরমাণুতে। শৈশবহীন শিশুর কাছে মা-বাবা ছাড়া আপনজন অচেনা, বেশিরভাগ সময় অধরা। আত্মীয় বলতে দাদু-দিদা। অন্য সবাই আঙ্কেল-আন্টি। জেঠু-কাকিমণি, ঠাম্মার দূরে নয়তো নির্বাসনে। আজকাল ঘরের কাছেই কাশী-বৃন্দাবন। গাল ভরা নাম অবসর, ওল্ড হোম। সগর্বে দুর্গোৎসবের থিম 'বৃদ্ধাশ্রম'। জানি না দর্শকদের কৌতূহল কুড়োয় না সহানুভূতি। শিশু ভোলানাথরা শোলকবলা কাজলাদিদি, ঠাম্মা-দিদুদের চেনে না। পৌষের পিঠের সুবাস নেই সুখী গৃহকোণে। পিঠের মানে জানতে চেয়ে বিপদ বাড়ে কিন্ডারগার্ডেনের আন্টির। শিশুর অর্জিত জ্ঞানে 'ব্যাক'। স্কুলে অসহায় আন্টি, বাড়িতে ম্যাম্ বোঝায়, এক ধরণের কেক। রাইস পাউডারে তৈরি। কোথায় তৈরি হয়?বেকারিতে? না এক সময় বাঙালি বাড়িতেই পরম আনন্দে, প্রাণভরা আহ্লাদ নিয়ে পুলিপিঠে, পাটিসাপটা, নলেন গুড়ের পায়েস তৈরি করতেন মা, ঠাকুরমা-রা। নিষ্পাপ কুঁড়ি আর ফুলেরা জানে না সংসারের অমন সাজানো বাগানগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? উত্তর কি বড়রাই জানে!

বোধ করি জানে না। জানে না বলেই মুখ ফিরিয়ে থাকে। মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চায় নিজেকে। ইচ্ছে ডানা মেলে উড়তে পারে না। নিজের স্বপ্নগুলো ভুলে এক কিম্ভূত পৃথিবীর বাসিন্দা বনে সুখের সন্ধান চালায়। যান্ত্রিক শাসনে জীবনকে সাজায়। শিশুরা তার বাইরে থাকতে পারে কি! পারে না। তাই একুশ শতকের যান্ত্রিক মানুষের শোকের আয়ু, সহানুভূতি পরমায়ু, স্মৃতির পরিমাপ করা কঠিন, বড় কঠিন।

কত নিস্পৃহভাবে মানুষ সময়কে ভুলে থাকে। হারিয়ে যাওয়া মানুষেরা শুধু হারিয়েই যায়। যারা আছে তাদেরই বা স্মৃতিতে রাখার দরকার কি! তাঁদের সৃষ্টি, তাঁদের অবদান, তাঁদের রক্তঘাম ঝরানো তোমাকে প্রাণিত করবে, তোমাকে শ্রদ্ধাবনত করবে এমন দিব্যি কেউ দেয়নি। ভুলে থাক, অতীত বলে ভুলে যাও। তাতে তোমার কি এসে যায়! আমরা মাকে ভুলেছি, মাটিকে করেছি অস্বীকার, শিকড়ের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে বয়ে গেছে। মানুষতো কোন ছাড়। ডামাডোল চলছে। কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক—ভাববার সময় বড় কম।

বিশ্বায়ন শ্লোগান ভরা পৃথিবীতে মানুষের সুকুমার বৃত্তির কদর বাড়ার লক্ষণ কোথায়? ছবি আঁকা যায় কম্পিউটারে গ্রাফিক্সের কায়দা কানুন রপ্ত করলেই। সেলফোনে রঙ-বেরঙের সংগীত শোনা যায় টেলিফোন এলেই। 'সাঁরে যাঁহা সে আচ্ছা........ দেশাত্মবোধ সজাগ হল টেলিফোন প্রাপক আর আশপাশের লোকের মনে। খেলাধূলার প্রাণ আজকাল প্রতিভা আর জয় করার নেশাতেই সীমাবদ্ধ না। ওর নিয়ন্ত্রণ পুরোটাই বিজ্ঞাপনদাতাদের হাতে। বাণিজ্যিক উপকরণ হিসাবে। না হলে ক্রিকেটের অত রমরমা। একশ কোটি দেশের মানুষকে মাতিয়ে দেওয়া গেছে যে। 'লগান' ছবি তৈরি হয়, অস্কারের মনোনয়ন সর্বস্তরের মানুষকে কৌতূহলী করে তোলে। কর্মনাশা খেলাটাকেই বিপণনে শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার করে বাজারিয়া সংবাদপত্রে। কৌশলে মানুষের জীবন জীবিকার প্রতিবাদ প্রতিরোধ সংগ্রামের ইতিবৃত্তকে করে তোলে অপ্রয়োজনীয়, বিরক্তিকর, কিছু পেশাদার ধুরন্ধর মানুষের খেলা হিসাবে। হায় ইতিহাস। হায় মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ! সবটাই এক কথায় বাতিল বলে অভিহিত—' শিল মোহরও জুটে যায়—এক ন্যায়াধীশের সৌজন্যে পথে ঘাটে আড্ডায় অফিসে একটাই আলোচ্য বিষয়। সত্যিই তো এতকাল সভ্যতা, কর্মসংস্কৃতি যে থমকে ছিল কারো নজরে আসেনি তো! স্মৃতি যদি মিথ্যে না হয়, এদেরইতো একজন ছেচল্লিশ হাজার টাকায় জনগণের অর্থে সাধের একটা চশমা বানিয়ে ছিলেন। স্বামী হত্যার মিথ্যে অভিযোগ থেকে এক অসহায় নারীকে মুক্ত করতে এঁদের তিন দশক লাগে। এক বেয়াড়া ভোটকর্মীকে কর্তব্যে অবহেলার দায়ে পাঁচশ টাকা জরিমানা করার রায় দিতে লেগে যায় পনের বছর! কোটি কোটি মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে এঁদের একজনই যথেষ্ট। সত্যি কি বিচিত্র এ দেশ! এই দেশে যুক্তি, বুদ্ধি, মুক্ত চিন্তার বিশেষ জায়গা নেই। যারা স্বঘোষিত অভিভাবক হয়েছেন, তারা এসব শুভ বোধের বিশেষ ধার ধারেন না। মাতামাতি করলেই হোল। কোন কাগজ কি লিখেছে তা নিয়ে নরক গুলজার। কাগজের কলমচিরাই আমাদের ত্রাতা-বিধাতা। তারা কখন সরব, কখন নীরব, কোন বিষয়ে সোচ্চার, কোন বিষয়ে নির্বিকার-তা নিরূপণ করা সাধারণ বুদ্ধিতে সম্ভব না। তাদের সুরে তাই বলতেই হয় 'ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর'। আসলে একটা জিনিস আজ দিনের আলোয় এসে গেছে—মানুষ সনাতন বিচার-বুদ্ধি, বোধ আর বিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে পারে না। আগামিতে আরও পারবেন না। নরম মন আর শাশ্বত সংস্কৃতি অনুগামীদের আজকের কঠিন পৃথিবীতে স্থান হবে না। জায়গা খুঁজতে হবে অন্য কোথাও। এবং ছোটবেলা থেকেই সেই অনুশীলনের মসৃণ পথে হাঁটতে হবে। পুরনো মূল্যবোধ বিংশ শতাব্দির বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় নিয়েছে পুরনো আর নতুন মানুষদের মন থেকে।

অনেক দেরি হয়ে গেছে। 'একটু পা চালিয়ে ভাই' পদাতিক কবির কণ্ঠে কণ্ঠে মেলাতে হবে। যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো। এই শক্তি মানসিকতা বরদাস্ত হবে না ভুবনায়নের পৃথিবীতে। পথে এবার নামো সাথী-পথেই হবে এ পথ চেনা।

এই যা! পথে নেমে পায়ে পা মিলিয়ে পথ চলা তো এই শহরে নিষিদ্ধ দিনের আলোয়! তা হলে?

(লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রণ করা হল)

শিশু মন ও আধুনিক সমাজ

সংগীতা ভট্টাচার্য্য (মনোবিদ)

সংঘমিত্রা, সাহাপুর নবারুণ সংঘ স.পে.আ.

আজকের ছেলেমেয়েরা কি অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে? এরা কি আবেগহীন? মানবিকতাহীন? এ প্রশ্ন ঘুরে ঘরে আসে—

আসলে তাদের আচার-আচরণ, ভাবনাচিন্তা বা মানসিকতা কিন্তু সবসময় তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব চরিত্রগত গুণাগুণের বহিঃপ্রকাশ নয়। পারিবারিক তথা সামাজিক পরিবেশে ও শিক্ষার প্রভাবে তার চারিত্রিক গুণাগুণ বিকশিত হয়। সে পরিবার ও সমাজ থেকে অনেককিছু শেখে। শৈশবে তার নিরাপত্তা, শিক্ষা ও মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধির উপাদান যদি পর্যাপ্ত না হয় তাহলে শুধু সে নিজেকে নিরাপত্তাহীন, অসহায় বলেই মনে করে না। তার মানসিক শান্তি ও স্থিতাবস্থাও ব্যাহত হয়। তার মধ্যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও প্রক্ষোভজনিত সমস্যা দেখা যায়। দুর্ভাগ্যের কথা, আমাদের দেশের সমাজজীবন, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রায় সবক্ষেত্রেই অসম প্রতিযোগিতা মূল্যবোধের অবক্ষয় ও দৈনতা আমাদের অস্থিরতাকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। শিল্পায়ন, শহরীকরণ একদিকে যেমন আগ্রাসী ভূমিকা নিয়েছে, অন্যদিকে সমাজের শরীরে পশ্চিমী জীবনধারার অবক্ষয় রূপ প্রকট হয়ে উঠেছে। পারিবারিক বন্ধন ভাঙ্গনের মুখে। নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির তথাকথিত নিশ্চিন্ততা যে দায়িত্বহীনতার মুখোশমাত্র তা অনেকেই বুঝতে ভুল করেন।

পিতামাতা নিজেদের অপূর্ণ ইচ্ছাপূরণের মাধ্যম হিসাবে সন্তানকে বেছে নিয়েছেন—দুর্ভাগ্যবশত সময়ের আগেই তারা ইচ্ছাপূরণের অদম্য বাসনায় উদগ্রীব। প্রতিযোগিতা চারিদিকে প্রতিযোগিতা। এর ফলে শৈশব নষ্ট হচ্ছে। কারণ তারা খেলাধূলার সুযোগ পাচ্ছে না, পারস্পরিক ভাব আদান-প্রদানের জায়গা পাচ্ছে না—নষ্ট হচ্ছে তাদের স্বকীয়তা। কারণ তাদের সামনে উদাহরণ রাখা হচ্ছে—তাদের মত হতে হবে। কি দুঃসহ আবেগহীন জীবন তাদের—যেখানে কখনোই কোনরকম রুটিন বহির্ভূত জীবন নেই। নেই বৃষ্টিতে ভেজার আনন্দ, নেই চুরি করে আচার খাওয়ার রোমাঞ্চ, প্রাণখোলা লুকোচুরি খেলা নেই। পাড়াতুতো দাদা, দিদি নেই যার কাছে আদরে-আবদারে কাটানো যায় খানিকটা সময়। আছে শুধু ভারী ভারী বই—প্রতিযোগিতায় জেতার তাগিদ, সারাদিন মোবাইলে মুখ গুঁজে থাকা—যার পরিণাম বিষাদ, হীনমন্যতা, অবসাদ, কখনো আত্মহননের হুমকি বা প্রবণতা। আজকাল অনেক অভিভাবককেই দেখি শিশুদের হাতে মোবাইল দিয়ে নিশ্চিন্তে কাজ করেন। সবসময় চলমান কিছু দেখলে আমাদের মস্তিষ্কের নিউরোট্রান্সমিটার উত্তেজিত থাকে। যার ফলে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। যার মধ্যে অন্যতম পরিচিত একটি হল ADHD (Attention Deficit Hyperactive Diesease)।

অবশ্য অভিভাবকরাও দ্বিধাগ্রস্ত। অনেকেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা বাধ্য হয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে ছেলেমেয়েদের অনেক অন্যায় আবদার, অশালীন আচরণ মেনে নেন। একবার ভাবেন ছেড়ে দিই, পর মুহূর্তেই আবার আঁকড়ে ধরেন। শিশুরা আজ ইঁদুর দৌড়ের শিকার। কোন শিশুকে অন্য কারও সঙ্গে তুলনা করবেন না। আবার এমনভাবে সবসময় আগলে রাখবেন না যা শিশুর আত্মনির্ভর শীলতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

শিশুরা আজ বড় একাকীত্বে ভোগে। এদের বয়সে আমরা একাকীত্ব শব্দের মানেই বুঝতাম না। প্রথমত—পরিবারেই এত লোকের মাঝে বড় হওয়া, দ্বিতীয়ত ছিল আমাদের সবপেয়েছির দেশ "সবপেয়েছির আসর"। প্রশিক্ষক কর্মীরা সেখানে আমাদের শরীরের শিক্ষণ থেকে মানসিক গঠন—পুরোটাই দেখতেন। আমাদের আদর্শ ছিল সবপেয়েছির আসর। আজও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে রেখেছে আসরগুলি। অভিভাবকদের অনুরোধ করব আপনার সন্তানকে আসরে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিন তবেই সে শরীরে এবং মনে একজন সুনাগরিক হয়ে উঠবে।

সবশেষে এটুকু বলি—সমাজ যেখানে পথভ্রষ্ট, সর্বত্র হিংসা আর অনাচার—সেখানে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা বা স্বার্থপরের মত নিজের সন্তানকে আগলে রাখলেই সমস্যা মিটে যাবে তা ভাবা ভুল। সন্তানের মেধা, আগ্রহ ও গ্রহণ ক্ষমতার ওজন অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তাকে স্বাবলম্বী করা দরকার। শৈশব থেকে অসম ও অসহনীয় প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দিয়ে তার শৈশব কেড়ে নেওয়ার মধ্যে যুক্তি থাকতে পারে না। অভিভাবক থেকে শিক্ষক এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন প্রতিবেশি প্রত্যেকেরই দায়িত্ব আছে। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মানসিক উৎকর্ষতা ও চরিত্র গঠনের সঠিক উপাদানগুলি জোগাড় করার। এই দায়িত্বকে এড়িয়ে গেলেও অস্বীকার করার উপায় নেই—একথা ভাববার সময় এসেছে।

মুখোশ তৈরি করা শিখে নাও

হরবোলা সুনীল আদক

আমাদের দেশে তোমরা নানা ধরণের মুখোশ দেখে থাকবে। বিশেষ করে মেলা-পার্বণে জীবজন্তুর মুখোশ দেখতে পাওয়া যায়। এই মুখোশগুলি ছেলেমেয়েদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। এ মুখোশগুলো অল্প খরচে ও অল্প সময়ে তৈরি করা যায়।

মুখোশ তৈরির উপকরণ :

১) ফেলে দেওয়া যে কোন কাগজ ও কাপড়

২) এরারুট বা ময়দা এবং তুঁতে আঠা তৈরি করার জন্য। (বর্তমানে ফেবিকল ব্যবহার করা হয়।)

৩) শিরিষের বা গঁদের আঠা বা ফেবিকল (রং-এ মেশানোর জন্য)

৪) কয়েকটি তুলি ও দু'তিনটে চওড়া ব্রাশ ($^১/_২$" থেকে ২" চওড়া)

৫) ছুঁচ, সুতো, ছুরি, কাঁচি।

৬) তারপিন তেল।

৭) রং মাখার জন্য যে কোন ছোট বাটি।

৮) ফ্রেন চক্ (চকের গুঁড়ো)

প্রস্তুত প্রণালি :

প্রথমে কাঁকর, বালি ছাড়া মাটি জোগাড় করা। সেই মাটি দিয়ে জীবজন্তুর বা কোন মানুষের মুখ (রাজা, মন্ত্রী, সেপাই) প্রভৃতি তৈরি করলে। যদি না পার তাহলে কুমোর বা পটুয়াদের দিয়ে তৈরি করে নিতে পার (এরপর সেই তৈরি মাটির উপর প্লাস্টার বা সিমেন্টের যেকোন উপাদান দিয়ে ছাঁচ প্রস্তুত করবে। ছাঁচ তৈরি হয়ে গেলে ভেতরের মাটি তুলে ফেলে দাও। এই ছাঁচকে পরিষ্কার করে নাও। এই বার ঐ ছাঁচের ভেতর গ্লিসারিন বা তেল জাতীয় মাখিয়ে নাও। কারণ ছাঁচ থেকে মুখোশ তুলে নিতে সুবিধা হবে।

কাগজগুলো কেটে ছোট ছোট টুকরো করে নাও। সেই টুকরো কাগজের উপর আঠা লাগিয়ে ঐ ছাঁচের ভেতরে সম্পূর্ণভাবে পুরোটা বসিয়ে দাও। তারপর ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো ঐ কাগজের উপর পুরোটা বসিয়ে দাও। যেন ভেতরের কোন জায়গা বাদ না পড়ে। তারপর আবার কাগজ ও কাপড় এভাবে চার-পাঁচবার লাগানোর পর ছাঁচ সমেত মুখোশটাকে দু'-তিন দিন শুকোবার জন্য রেখে দেবে। দু'-তিন বার লাগলে মুখোশটি মজবুত হয় না। শুকিয়ে যাবার পর সতর্কভাবে ধীরে ধীরে মুখোশটাকে ছাঁচ থেকে তুলে ফেলতে হবে। তুলে ফেলার পর দেখা যাবে মুখোশটির চারদিকে কিছু কিছু কাগজ এলেমেলো ভাবে বেরিয়ে আছে। এই বেরিয়ে থাকা কাগজগুলো সমান করে কেটে ফেলতে পার বা আঠা দিয়ে সযত্নে তুলে না ফেলে লাগিয়ে দিতে পার।

এবারে ফ্রেন চক্ শিশির আঠার সঙ্গে বর্তমানে ফেবিকলের সঙ্গে মিশিয়ে ঐ মুখোশের উপর হালকাভাবে লাগিয়ে দিতে হবে। শুকিয়ে যাবার পর শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘসে মসৃণ করে নাও। প্রাথমিকভাবে সাদা রং লাগাবার পর শুকিয়ে গেলে নিজের পছন্দ মতো সুন্দর করে মুখোশের গায়ে নক্সা করে নাও। রং নির্বাচনের সময় মনে রাখতে হবে মুখোশে যত বিভিন্ন উজ্জ্বল রং (Contrast Colour) ব্যবহার করা যাবে মুখোশ ততই আকর্ষণীয় হবে। সাদা রং লাগাবার পর ধীরে ধীরে চোখ, মুখ ইত্যাদি আঁকা যেতে পারে। রং লাগানোর পর ইচ্ছা করলে বার্ণিশ লাগানো যেতে পারে। মুখোশের উপর জল লাগলেও রং উঠবে না। বার্ণিশ লাগানোর প্রধান কারণ হল মুখোশের চাকচিক্য বেড়ে মুখোশটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। পুজোর সময় তোমরা দেখে থাকবে কোন কোন প্রতিমা সাদামাটা। আবার কোন প্রতিমার মুখে বার্ণিশ লাগানো থাকে। বার্নিশ লাগানো প্রতিমার মুখে আলো পড়লে আরও উজ্জ্বল দেখায়।

মুখোশের গায়ে রং বা বার্ণিশ লাগানোর পর ব্রাশটি যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য তারপিন তেলে ধুয়ে নিতে হয়। আর এরারুট বা ময়দার আঠা তৈরির সময় তুঁতে মেশালে আঠা সহজে পচে না বা পোকা ধরে না। বর্তমানে মানুষ বেশিরভাগ ফেবিকল ব্যবহার করে।

এখন মানুষ এইসব বাদ দিয়ে আরও সহজভাবে হালকাভাবে মুখোশ থার্মোকল ও ফোম দিয়ে তৈরি করছে। এতে অর্থের প্রয়োজন হয়।

আমাদের রাজ্যে পুরুলিয়ার আদিবাসীরা কিছু সংখ্যক মানুষ মুখোশ তৈরি করে অর্থোপার্জন করেন। ছৌনাচ দেশে-বিদেশে দেখিয়ে বেড়ায়। বিভিন্ন ধরণের মুখোশ তৈরি করা পেশা বলে মনে করেন। এইসব মুখোশ তৈরি করে অনেকেই স্বনির্ভরশীল হয়েছে।

যেসব মুখোশের কথা বলা হল তোমরা সেগুলি ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে ঘর সাজিয়ে রাখতে পার। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে খেলাধুলা ও আনন্দের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া তোমরা তোমাদের আসরে সোনারকাঠি ভাই-বোনদের নিয়ে 'মুখোশ নাটিকা' বা 'পুতুল নাটক' করতে পার, যা মানুষের কাছে অনেক — অ-নে-ক আনন্দদায়ক বা আকর্ষণীয় হবে।

ভালো মুখোশ তৈরি করতে হলে, একটা কথা সবসময় মনে রাখতে হবে যে ভালো ড্রইং জানা দরকার। যেসব ছেলে-মেয়েদের অল্প শিল্পরুচি আছে তাদের পক্ষে এ মুখোশ করা অত্যন্ত সহজ। এই সঙ্গে আর একটা জিনিস হল কল্পনা শক্তি। যার কল্পনাশক্তি যত প্রখর তার আঁকা মুখোশ হবে তত উন্নত মানের।

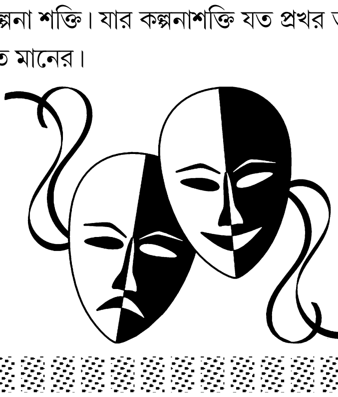

চাই ঐক্যবদ্ধ গতিময় সবপেয়েছির আসর

প্রদীপ রায়

(সহ: সভাপতি, স.পে.আ.)

বৈশাখের খরতপ্ত দাবদাহের পর অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ সকালে মেঘ কালো করে নেমে এল অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। প্রাণের উচ্ছলতায় যখন সবে একটু মেতে উঠেছি ঠিক তখনই মোবাইলটা বেজে উঠল, ফোনটা ধরতেই অপর প্রান্ত থেকে ভেসে উঠলো অপূর্বর গলা, "প্রদীপদা সবপেয়েছির আসরের নক্ষত্র পতন হলো"। আর জানবার কিছু ছিল না, বুঝলাম আমাদের 'সনৎদা' আর নেই। সব আনন্দের আলো কেমন নিভে গেল, আনমনে বলে উঠলাম, 'সূর্য অসময়ে অস্তাচলে গেল।

সনৎদা আমাদের কাছে সত্যিই সূর্যের মতো দেদীপ্যমান হয়ে সবপেয়েছির আসরের পরিবারকে গত ৭৫ বছর ধরে ভাস্বরিত করে রেখেছিলেন। তাঁর আদর্শে, তাঁর কর্মপ্রেরণা, সবপেয়েছির আসরের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, ভালোবাসা আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল, তাঁকে ঘিরেই এমন বিশাল বৃত্ত তৈরি হয়েছিল যার মধ্যে অগণিত সোনারকাঠি আর কর্মীরা সবপেয়েছির আসরকে চিনেছিলো, ভালোবেসে ছিল, নিজেদের জীবনকে তৈরি করেছিল সত্যিকারের মানুষ হবার ব্রত নিয়ে।

আমরা বিভিন্ন সময় বলে থাকি আমাদের আসর প্রতিষ্ঠাতা স্বপনবুড়ো মানুষ গড়ার কারখানা তৈরি করেছিলেন। হ্যাঁ, ঠিকই তাই এর Raw Material হচ্ছে আমাদের সোনারকাঠি ভাইবোনেরা। আর ছিল এক বৃহৎ সংখ্যক নিরলস কারিগরদল যারা স্বপনবুড়োর ইচ্ছা আর স্বপ্নকে মূল্য দিয়ে এইসব সোনারকাঠিদের তিল তিল করে গড়ে তুলে দেশের তথা বিশ্বের দরবারে এক উপযুক্ত সম্পদ উপহার দিয়ে যাচ্ছে এখনও। এই অসংখ্য কারিগরের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে অন্যতম আমাদের সনৎদা। তাঁর কর্মনিপুণতা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা, নিয়মানুবর্তিতা, পরিকল্পনা ছিলো এই মানুষ গড়ার কারখানার শ্রেষ্ঠত্বের মূল মন্ত্র।

প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রীয় সভায় স্বপনবুড়ো বলতেন 'সনৎ' হচ্ছে সবপেয়েছির আসরের শক্তিশালী স্তম্ভ, একে যেন আমরা মর্যাদা দিই, অনুসরণ করি, আর সেই কথা একবাক্যে মেনে নিয়ে অগণিত আসর কর্মীর কাছে সনৎদা আজ "শিক্ষাগুরু", "আসর গুরু" হিসাবে মান্যতা পেয়েছেন।

সনৎদার কথা বলতে গেলে তাঁর শৈশব জীবন, কৈশোর জীবনের কথা আসবেই, সেখানে লেখা আছে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের কথা, তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখেছেন, পঞ্চাশের মন্বন্তরের সাক্ষী ছিলেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়ানকতা উপলব্ধি করেছেন। দামাল ছেলে সনৎদা বাগবাজার গঙ্গা এপার-ওপার করেছেন, ডুবন্ত যুবককে উদ্ধার করে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মাঠে-ঘাটে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন আর গ্রামীণ খেলা খেলে। এর মধ্যেই বুদ্ধদেব চক্রবর্তীর (দাদাভাই) মন্ত্র শিষ্য হয়ে নিবেদিতা আসরের মাধ্যমে সবপেয়েছির আসরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে কৃতিত্বের সাথে শিক্ষার গণ্ডী এক এক করে পেরিয়েছেন সাফল্য সহকারে। আবার পরিবারের স্বার্থ রক্ষা করতে উচ্চতর শিক্ষার জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন। নানাবিধ রন্ধনে নিপুণ সনৎদা নানা কারণে পার্থিব সাংসারিক জীবনে প্রবেশ না করে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন সবপেয়েছির আসরের বৃহত্তম পরিবারের কল্যাণ সাধনে আর তা শেষদিন পর্যন্ত করে গেছেন।

আমি সনৎদাকে দেখেছি প্রতিটি আসর কর্মীর প্রতি ছিল তাঁর অগাধ আস্থা এবং অন্তর্দৃষ্টি। কার কাছ থেকে কিভাবে কাজ পাওয়া যায় এবং সেটা কিভাবে আদায় করতে হয় তার সবটাই ছিল তার হাতের মুঠোয়। এইভাবে আমার মত একজন অখ্যাত আসরকর্মীকে তিনি কেন্দ্রীয় পরিচালন সমিতির সদস্য করেছেন ১৯৬৫ সালে। তারপর থেকে আমার বিভিন্ন পদে উত্তরণ ঘটেছে তাঁরই কল্যাণ স্পর্শে।

আমাকে তিনি সাংস্কৃতিক জগতে নিয়ে এসেছেন তাঁর হাতে গড়া নবমিতালি সবপেয়েছির আসরের মাধ্যমে। তাঁর নির্দেশে, পরামর্শে আমি লিখেছি, পরিচালনা করেছি প্রায় ৩০টি নাটক, নৃত্যনাট্য। অনুষ্ঠানের পর তিনি পুরো উপস্থাপন বিশ্লেষণ করে বোঝাতেন কোনখানে আমি ঠিক, কোনখানে তাঁর ভালো লাগেনি। পরবর্তীকালে সেইমত নিজেকে আরও তৈরি করার চেষ্টা করতাম। সনৎদাও অসংখ্য ছড়া-নাটিকা লিখেছেন, যারা নবমিতালির মূল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেত না তাদের সনৎদা সুন্দরভাবে শিখিয়ে মঞ্চস্থ করে সকলের বাহবা কুড়িয়েছেন।

আমি দেখেছি প্রত্যেকটা শিবিরে তাঁর উপস্থিতি ছিল কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। সেই ভোরবেলা সকলের আগে ঘুম থেকে উঠে সারাদিন কঠোর শিক্ষণের পর নিজের থালা-গ্লাস নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে আহার গ্রহণ করতেন। তারপরে দুপুরে সাংগঠনিক ক্লাস সেরে নেমে পড়তেন বিকালের শিক্ষণশ্রেণীতে। তারপর আসতো সেই আলোকময় সান্ধ্য মজলিস যেখানে তিনি ছিলেন মধ্যমণি। একাধারে বিচারক, অন্যধারে কেন্দ্রীয় কর্মীদের অনুষ্ঠানে দইওয়ালা, রাম, লক্ষ্মণ-এর মত আকর্ষণীয় চরিত্রের অভিনয় ছিল অবিস্মরণীয়। রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে শিবিরের সারাদিনের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে শিবির পরিচালকদের কাছে মতামত জানাতেন। শিবিরের মূল উদ্দেশ্য শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষণ-এর সবকটা মেনে চলার বিষয়ে সনৎদা ছিলেন অনন্য। সনৎদা আত্মসমালোচক হলেও আত্মপ্রচারক কোনদিন ছিলেন না, এটাই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। আমরা অনেকেই বিভিন্ন শাখা আসর প্রতিষ্ঠা করেছি, কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে হয় সেই আসরের অস্তিত্ব হারিয়ে যায় অথবা আমরাই তার সাথে যোগসূত্র ছিন্ন করতে বাধ্য হই। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, একমাত্র সনৎদাই তাঁর হাতে তৈরি করা নবমিতালি আসরের সঙ্গে একইভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর এই সংসার থেকে চলে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এমনকি তাঁর শেষ অবস্থায় চিকিৎসা, পরিশেষে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, আর শেষ কাজ এই নবমিতালি আসরই সুসম্পন্ন করেছে। তিনি পিতার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা পেয়েছেন এদের কাছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

সনৎদার স্মৃতি ভাণ্ডার ছিল শেষ দিন পর্যন্ত অম্লান। সবপেয়েছির আসরের ৭৫ বছর ধরে যত সোনারকাঠি বা কর্মীর সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, কাউকে বিন্দুমাত্র ভোলেননি। ফোনে বা পত্রে তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং নবমিতালি বা কেন্দ্রের সব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতেন।

তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন জ্ঞানআহরণকারী ছাত্র ছিলেন। যেখানেই শুনতেন কেউ কিছু ভালো ব্যায়াম, ছড়া কিংবা লোকনৃত্য শেখাচ্ছেন অমনি সেখানে ছুটে যেতেন, দেখতেন না কোনও প্রতিষ্ঠানের ভেদাভেদ—সে মণিমেলা, স্কাউট, জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসংঘ কিংবা এই সম্বন্ধীয় কোনও বিশেষ ব্যক্তি কিনা। হাতে থাকতো খাতা-পেন্সিল। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তা শিখে আবার বিলিয়ে দিতেন আসরকর্মীদের কাছে। বিভিন্ন শিবিরে সেইসব শিক্ষায় সম্ভারিত হতো আসরকর্মী তথা সোনারকাঠিরা। বিভিন্ন শিশু প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎসবে প্রয়োজনে প্রবেশপত্র কিনে উপভোগ করতেন তাদের নাটক, নৃত্যনাট্য, উপস্থাপনাকে। ফিরে এসে আমাদের জানাতেন সেই অভিজ্ঞতার কথা, যাতে আমরাও আরও নতুন ভাবনা চিন্তা করতে পারি। তাই তিনি ছিলেন বিনা প্রশ্নে আমাদের শিক্ষাগুরু।

সবপেয়েছির আসরের শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে তিনি প্রবর্তন করেছেন আসর প্রবেশিকা, আসর মধ্যম, অগ্রণী, অগ্রদূতের মতো শিক্ষণসূচী, লিখেছেন শিক্ষণের উপর বেশ কিছু বই, যাতে আসর সদস্যরা উপকৃত হয়। তাঁর হাতেই তৈরি বর্তমান কেন্দ্রীয় আর শাখা আসর সংবিধান, মাধ্যমিক শারীর শিক্ষণের কর্মসূচী। আমরা ভাবতেই পারিনা নানান বিষয়ে এতো বিশালতা তিনি পেলেন কোথা থেকে! তাই ওপার বাংলার খেলাঘর আসর তাঁকে নিয়ে যেতেন শিবিরে শিক্ষাদানের জন্য। তাঁকে সম্মানিত করতেন নানাভাবে।

তাঁর সম্বন্ধে লিখতে গেলে কলম থামানোর কোনো প্রশ্নই নেই। কারণ অতল সাগরের মতো ছিল তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার, সাফল্যে ভরা আসর কর্মজীবন। পরিশেষে যে কথাটা না বললেই চলে না, তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন ঐক্যবদ্ধ সবপেয়েছির আসরকে। ১৯৬২ সালে তিনি দেখেছিলেন এক বিশাল কর্মী সম্পদকে সবপেয়েছির আসর ত্যাগ করে অন্য প্রতিষ্ঠানের ডাকে সাড়া দিতে। সেদিন কিন্তু তিনি অনেক প্রলোভনেও যাননি, মূলস্রোতেই থেকে চেয়েছিলেন তাদের পরিবর্তে নতুন কর্মী সংযোজন করে সেই বাধাকে অতিক্রম করতে। পরবর্তীকালে ১৯৭০ সালে কেন্দ্রের এ্যাড হক কমিটি তৈরির কারণে অনেক অভিজ্ঞ কর্মীকে কেন্দ্র ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। তাই তিনি একটা বিষয়ে সজাগ ছিলেন, কোন কারণেই যেন আর কাউকে হারিয়ে যেতে না হয়। সম্প্রতি তিনি এরকম কারণেই উদ্বিগ্ন ছিলেন। আমাদের মতো কয়েকজনকে তিনি এই আশংকার কথা জানিয়েও ছিলেন। আমরা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম এই বলে যে—আপনি যখন মাথার উপরে আছেন তখন সব ঠিক থাকবে। সবাই সবপেয়েছির আসরের মূলস্রোতেই থাকবে। আমরা সবাই চাইবো আমাদের 'আসরগুরু' সনৎদার একান্ত বাসনা ঐক্যবদ্ধ সবপেয়েছির আসর যেন বহু বহু কাল ধরে গতিময় হয়ে চলুক, তবেই তাঁকে যথাযোগ্য সম্মানিত করা হবে। তাঁর আদর্শ, তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, কর্মনৈপুণ্য জীবনের কথা প্রতিনিয়ত আগামী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই হোক আমাদের মূলমন্ত্র।

আসরই খো খো-কে জনপ্রিয় করেছে

বলরাম হালদার (ক্রীড়া সচিব)

খো খো-র জন্য দরকার ২টি কাঠের খুঁটি। ২৭ বা ২৪ মিটার লম্বা ১৬ বা ১৪ মিটার প্রস্থ এক ফালি জমি। মাটিতে দাগ কেটে বা চুণের দাগ দিয়ে এক সাথে ১২ জনের দুই দলে মাঠে নেমে প্রতিযোগিতা করা যায়। খরচা নেই বললেই চলে। আসরের মাঠে সোনারকাঠিরা মেতে উঠে লড়াই করার মানসিকতা অর্জন করে। খেলার মধ্যে খুঁজে পায় কোর্টের সৌন্দর্য্য, দলবদ্ধ উৎসাহ, স্বল্প জায়গায় দ্রুত গতি অর্জন, বিভিন্ন কৌশলাদি, প্রয়োজনীয় বুদ্ধি যথা সময়ে প্রয়োগ করার কৌশল। যে কোন দলগত খেলা থেকে খো খো তার নিজস্বতা বজায় রাখার জন্য ও দেহ-মনকে সুস্থ সবল রাখার গুণের জন্য শাখায় শাখায় সবপেয়েছির আসরে এই খেলার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আজ তুঙ্গে।

বিদেশীরাও সহজেই খো খো-কে গ্রহণ করছেন। খেলার মধ্যে ফোর 'এস' যে কোন খেলায় অপরিহার্য। যা খো-খো-র মধ্যে রয়েছে—স্কীল (কৌশল), স্পীড (গতি), স্ট্যামিনা (ক্ষমতা), স্ট্রেনথ (শক্তি)। এছাড়া দম, বুদ্ধি, তৎপরতা ও ভারসাম্য অর্জন খো খো-র মধ্যে রয়েছে।

সবপেয়েছির আসরই এই 'কমপ্লিট' গেম খো খো-কে দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের রাজ্যে জনপ্রিয়তার নিরিখে প্রসারের জন্য অন্যতম ভূমিকা পালন করে আসছে। আসরের মান-সম্মান, ঐতিহ্য তুলে ধরেছে। গত কয়েক বছর ধরে রাজ্য প্রতিযোগিতায় ও কলকাতা লিগে সর্বস্তরে প্রথম ৪টি দলের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে আমাদের মূলকেন্দ্রের খো-খো দল। ২০২০-তে সাব জুনিয়রে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন ও জুনিয়ারে ৩য় স্থান লাভ। ২০২১ আবার ফাইনালে লড়াই করে (এ্যাসোসিয়েশন কাপ) শেষ অবধি রানার্স আপ। কৃতিত্ব অবশ্যই আলোকদূত, বিবেকানন্দ ও গুড়াপের শাখা আসরগুলির বেশি। মুখ্য প্রশিক্ষক বাংলার কোচ কৃষ্ণরঞ্জন চক্রবর্তী এবং তাঁকে সহায়তা করে রাজ্য ক্রীড়াশ্রী প্রকল্পের বাংলার গৌরব সম্মান পুরস্কারে পুরস্কৃত দেবাশীষ সেন, চিরঞ্জিত চৌধুরি। বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক ননী হাওলাদারসহ কয়েকজন প্রাক্তন খেলোয়াড়ও এই প্রকল্পের কারিগর।

খো-খো ছাড়াও বিভিন্ন শাখা আসরগুলি যোগাসন, অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, বলব্যাডমিন্টন, কাবাডি, আটিয়া-পাটিয়া ও ফুটবলে পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। খো-খো খেলোয়াড়রা অন্য খেলাতেও যে সক্ষম তা জেলায় জেলায় তুলে ধরেছে। কেন্দ্রীয় দল খো-খো, বলব্যাডমিন্টন, কাবাডি, আটিয়া-পাটিয়া ও যোগাসনের রাজ্য অন্তর্ভুক্ত সংস্থায় নিয়মিত

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 48

অংশ নেয়। জেলার শাখা আসরগুলি নিয়মিত জেলা সংস্থার সাথে বিভিন্ন খেলায় অনুশীলন ও প্রতিযোগিতায় পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে।

সবপেয়েছির আসর রাজ্য খো-খো সংস্থার অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে ৩০ বছর আগে থেকেই নিজস্ব সারা বাংলা আন্তঃ অঞ্চল প্রতিযোগিতা সংগঠন করে আসছে। বিভিন্ন শাখা আসর পূর্বে রাজ্য প্রতিযোগিতায় পারদর্শিতা দেখিয়েছে, বিশেষ করে কলকাতার মুকুল, কুমারটুলি, নবমিতালি, হাওড়ার বালি শিশুসাথী, উঃ ২৪ পরগণায় আনন্দমঠ, এছাড়া হুগলীর বলাকা, সঞ্চিতা, ভ্রাতৃসংঘ, নদিয়ার কোর্টপাড়া, নাসরা, মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ ও বহরমপুর, বীরভূমের আহমেদপুর, দঃ ২৪ পরগণার সাতগাছিয়া, মালদার বৈতালিক, কোচবিহারের ওকরাবাড়ি, জলপাইগুড়ির আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর ও আসানসোল প্রভৃতি। উক্ত আসরগুলির খেলোয়াড় ছাড়া বাংলা / জেলা দল গঠন হত না। সত্যি বলতে এখনও হয় না! গত সাব-জুনিয়র, জুনিয়র ও সিনিয়রে (২০২১-২২তে) ১৮ জন খেলোয়াড় বাংলার হয়ে জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করে আসরের সম্মান বাড়ায়। বাংলা ৩য় স্থান লাভ করে। কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষকবৃন্দ কোচ, রেফারি ও ম্যানেজার হিসেবে রাজ্যকে সহায়তা করেন।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সদস্য বা প্রশিক্ষকবৃন্দ সারা ভারতে পারদর্শিকতা দেখায়। যেমন-প্রথম সর্ব্বভারতীয় রেফারি ঁসনৎ ভট্টাচার্য, ঁপ্রভাস দা, ঁক্ষুদিরাম দা, ঁনিশিথ দা, ঁঅতুল দা। এছাড়া স্বপন চক্রবর্ত্তী, অজয় চক্রবর্ত্তী, সুবোধ ঘোষ, ভাস্কর দত্ত মজুমদার, অজিত বর্ম্মন প্রমুখ। কোচ হিসেবে বাংলার পদক এনে দিয়েছেন প্রণব রায়, প্রয়াত ক্ষুদিরাম, তপন তালুকদার, তারক মজুমদার, তপন দাস, কৃষ্ণরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, তরুণ চৌধুরি ও বলরাম হালদার।

কেন্দ্রীয় সদস্যদের মধ্যে সভাপতি কমলেশ চ্যাটার্জী (রাজ্য সভাপতি ও ভারতের সহ সভাপতি), অপূর্ব গাঙ্গুলী (রাজ্য সহ সভাপতি), বলরাম হালদার (চেয়ারম্যান, রাজ্য), তারক মজুমদার (চেয়ারম্যান-সিলেকশন), রাজ্য সরকারের খেতাব সম্মান পেয়েছেন তপন দাস (২৫ হাজার, (১ম এশিয়ান স্বর্ণপদক জয়ী দলের), বীনা দাস (বাংলার গৌরব ১ লক্ষ), ৫০ হাজার টাকা করে খেল সম্মান দেবাশীষ সেন ও চিরঞ্জিত চৌধুরী, সালমা মাঝি ও জ্যোতি বিশ্বকর্মা। কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থার সম্মান পায় কমলেশ চ্যাটার্জী (সংগঠক), বলরাম হালদার (প্রশিক্ষক) খেলোয়াড় হিসেবে রাজকুমার দাস, বিউটি দাস সহ আরও বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়।

আসরের খেলোয়াড়বৃন্দ খো-খো সংস্থা ছাড়াও নিজ নিজ স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। এর ফলে বিভিন্ন ট্রেনিং ও পেশাগত জায়গায় আসরের খেলোয়াড়রা জায়গা পাচ্ছে।

বিগতদিনে ভারত ও রাজ্য সরকারের নিয়মিত অর্থনৈতিক স্কলারশীপও আসরের খেলোয়াড়রা পেতো। রাজ্য সরকারের তরফে ২০১৫-তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে ২৫ হাজার টাকা সম্মান পায় দেবাশীষ সেন ও ননী হাওলাদার কেরল জাতীয় গেমসে পদক জয়ের জন্য।

অনুশীলন সূচী : প্রিয় সোনারকাঠি ও কর্মীভাই বোনেদের নিয়মিত ন্যূনতম ১ ঘন্টা অনুশীলনের মাধ্যমে তৈরী হতে হবে। সম্ভব হলে সপ্তাহে ৫/৬ দিন। মাঠ পরিষ্কার করে নিতে হবে নিজেদের। ওয়ার্ম আপ, দৌড়, জাম্প, স্ট্রেচিং করে নাও। স্কিপিং করো, হাইনি (HIGH KNEE) অ্যাকশন করো, ডিগবাজি সোজা ও উল্টো, বক্সে বসো পর পর, খো দাও পর পর। পোল টার্নিং, এড়োপথে সোজা, ঝুঁকে হনুমানের চলনের মতন ওঠো, বারবার। ট্যাপিং-হ্যামারিং করো। সবগুলি শ্যাডো ও খেলোয়াড়দের নিয়ে অভ্যস্ত হতে হবে। রানার হিসেবে সিঙ্গল চেন, ডবল চেন, ডজ, পালটি প্রভৃতি করো। ভুলবে না কুলিং ডাউন করতে। যোগ ব্যায়াম, বসে-শুয়ে-দাঁড়িয়ে-উপুড় হয়ে ধীর লয়ে ব্যায়াম। ১/২/৩ জন হলেই অনুশীলন করা যায়। নিজেকে নিজের মতন তৈরী করতে হবে।

রানারকে চেজার আউট করতে পারে নিয়ম ভঙ্গ না করে স্পর্শের মাধ্যমে। খেলা চলাকালীন বাইরে গেলে, ব্যাচের শেষজন আউট হওয়ার পর ২টি খো-খো মধ্যে নামতে না পারলে। রেফারী দ্বারা শাস্তিমূলক আচরণেও আউট। ফাউলগুলি ভালভাবে আয়ত্তে আনতে হবে। কেন্দ্রপথ স্পর্শ করা যাবে না। খো দিতে আগে টাচ্ করো, খো পাবার পূর্বে ওঠা যাবে না। এড়োপথ ছেড়ে পিঠে খো দেওয়া যাবে না। একদিক থেকে অন্যদিকে পোলে যাবার সময় পিছনের জমি স্পর্শ করা যাবে না। পোলের কাছে চেজারকে স্পর্শ করে গেলে খো দিতে হবে। পোল লাইন থেকে রওনা হয়ে আবার অন্যদিকে গেলে দিক পরিবর্তন ফাউল। খো জোরে এবং পরিষ্কার উচ্চারণে বলতে হবে।

প্রতিযোগিতার সময় রানারকে এক এক করে ধরবে। রানারের কাছাকাছি হলেই হাত বাড়াও। ফাউল হলে সাথে সাথে রানারের উল্টো দিকে যাও – খো দাও বা অন্য রানারকে আউটের চেষ্টা কর। এড়ো পথ ধরে উঠে রানারের কাঁধ বরাবর ওঠো। চেন ভাঙো রানারের আগে গিয়ে খো দিয়ে। 'রানার' হিসেবে চেন খোলো। ডবল চেন বেশি করো। ২/৩ জন থাকলে জায়গা বদল করো। নিজের মতন চেজারকে খেলাও। চেজারের থেকে দূরে থাকো।

* খেলার জন্য সাহস, একাগ্রতা, নিষ্ঠা, সময়জ্ঞান, শৃঙ্খলা ও সহযোগিতা প্রভৃতি নিজেদের আয়ত্ত করতে হবে।

* খেলার জন্য ক্রীড়াবিজ্ঞান ও চিকিৎসার সহায়তা নাও।

* অনুশীলনের আগে ছোলাবাদাম ভিজিয়ে খাও। কলা, খেজুর, আমন্ড খাও।

* খালি পেটে কখনই মাঠে নামবে না।

সবপেয়েছির আসর ১ম এশিয়ান ও নেতাজী গোল্ড কাপ এবং ইন্দো-বাংলা গেমসে খো-খো তে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।

আসর কর্তারা এগিয়ে এসে প্রশিক্ষণ ও রেফারী হতে পারো। অনুশীলনের সুযোগ পেলেই অংশ নাও। খো-খো আজ আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। আসরের খেলোয়াড়রা 'আলটিমেট' এবং 'খেলো ইন্ডিয়া'তে অনেক জন অংশ নেবে।

সরকারী প্রকল্পে খো-খো, কাবাডি, যোগাসন ও ব্রতচারী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনেক প্রাক্তন আসরের সভ্যগণ খো-খো তে রাজ্য সরকারের 'অবসর খেলোয়াড় সম্মান ভাতা'তে ফর্মপূরণ করেছেন।

আগামীতে আই.পি.এল. / আই.সি.এলের / প্রো-কাবাডির মতন ৬টি দল নিয়ে 'আলটিমেট' খো-খো হতে চলেছে। বাংলার ৫ জনের মধ্যে কেন্দ্রীয় দলের চিন্ময় নন্দী এবং বাংলার একমাত্র কোচ প্রাক্তন সোনারকাঠি তন্ময় সাহা (বহরমপুর) সুযোগ পেয়েছে, যা খেলোয়াড়দের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সাফল্য এনে দেবে।

আনন্দ ও গর্বের বিষয় নদীয়ার কোর্টপাড়া আসরের জনপ্রিয় খো-খো কোচ ও সংগঠক বর্তমানে মূলসত্যসেবী (সাধারণ সম্পাদক) হিসাবে শ্রী দিলীপ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও উজ্জ্বলতার সাথে বিরাজ করছেন।

জয় হোক আসরের খেলাধূলার

ফিরে দেখা ইতিহাস : স্বাধীন ভারতে জন জাগরণ এবং সবপেয়েছির আসরের নববর্ষ উৎসবের সূচনা

ডঃ অনির্বাণ ঘোষ

বিংশ শতকের শুরু থেকেই অবিভক্ত বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সাথে সুস্থ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে শিশু-কিশোরদের খেলাধূলা, ব্রতচারী, কুস্তি, ব্যায়ামশালা, আখড়া, ফুটবল বা বিভিন্ন গ্রামীণ খেলাধূলার প্রচলন বাড়ছিল। তিরিশের দশক থেকে গুরুসদয় দত্ত প্রতিষ্ঠিত ব্রতচারী আন্দোলন বাঙালীর ঘরে ঘরে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। চল্লিশের দশকের গোড়া থেকেই কুচকাওয়াজ ও ড্রিল-পিটি-র মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের সুস্থ শরীর গঠনের প্রক্রিয়া জোরদার হচ্ছিল।

সবপেয়েছির আসর এবং 'নববর্ষ উৎসব'

সবপেয়েছির আসরের পরিচালনায় দেশবন্ধু পার্কে 'নববর্ষ উৎসব' সর্বপ্রথম ১৯৪৮ সালের ১৪ই এপ্রিল, বুধবার (১৩৫৫ সালের ১লা বৈশাখ) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর মাত্র কয়েক মাস আগে ভারত স্বাধীন হয়েছে। কাজেই সাধারণ মানুষের আবেগ ছিল প্রাণঢালা ও উৎসাহ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। সকাল সাতটার সময় দেশবন্ধু পার্কের মূল জমায়েত শুরু হয়েছিল। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারী এবং উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করেন অধুনালুপ্ত 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ডাঃ অমর মুখোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগের পক্ষ থেকে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন সমগ্র অনুষ্ঠানের সিনেমা করেছিল। এর সঙ্গে বিকেল ছয়টায় কেন্দ্রীয় আসর শোভাবাজার রাজবাড়িতে নববর্ষ উপলক্ষে বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

নববর্ষ উৎসবের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল সকাল ৯টার সময়। শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারীকে দেশবন্ধু পার্কের গেটে অভ্যর্থনা জানান সবপেয়েছির আসরের প্রতিষ্ঠাতা 'স্বপন বুড়ো' শ্রী অখিল বন্ধু নিয়োগী, ন্যাশনাল হেলথ্ প্ল্যানিং বোর্ডের কর্ণধার ডাঃ অমর মুখোপাধ্যায় এবং অশোক দত্ত। প্রথাগত অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের পর ব্যান্ড বাজানোর মাধ্যমে গভর্নর পতাকা উত্তোলন করেন এবং অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম নববর্ষ উৎসবে গভর্নর রাজাগোপালাচারী সকলকে আশীর্বাদ করে জনসাধারণের আশীর্বাদ কামনা করেন। তাঁর দীর্ঘ ভাষণে জাতীয় জীবনে উৎসবের এবং আনন্দের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রথমেই শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় নববর্ষের মাত্র কয়েক মাস আগে আততায়ীর গুলিতে নিহত জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীকে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, 'বিগত বর্ষের বেদনাময় স্মৃতি আমরা নববর্ষে বহন করিতে চাহি না। এই বৎসরে মানুষকে ভালবাসিবার,

সেবাব্রত গ্রহণ করিবার নূতন সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। আজ যাহারা কুঁড়ি—যাহারা কিশোর তাহারা যে দিন প্রস্ফুটিত হইবে সেই দিনই নতুন ভারত দেখা দিবে। আমরা যে স্বাধীনতা পাইয়াছি তাহার রূপ এখনও উপলব্ধি করা যাইতেছে না। দেশে দুঃখ আছে, বেদনা আছে—লাঞ্ছনা আছে। এই দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিবার দায়িত্ব আমাদেরই তরুণদের। নববর্ষে তাহারা সেই সঙ্কল্পই গ্রহণ করুক' (যুগান্তর পত্রিকা, ১৬ই এপ্রিল, ১৯৪৮)। এই বক্তব্য তৎকালীন ভারতের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সদ্য স্বাধীন দেশের নব প্রজন্মের প্রতি আশা আকাঙ্খার কথাকেই দিক নির্দেশ করে।

'আসরের ছেলেমেয়েরা উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিবার পর রবীন সরকার ও শৈলেন সরকারের অধিনায়কতায় হাজার হাজার ছেলেমেয়ে উপস্থিত মায়ের দল, অভিভাবকবৃন্দ, সাহিত্যিকদল এবং মাননীয় সভাপতিকে সমবেত ব্যায়াম ও নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক প্রদর্শন করে। এই খেলাধূলা সম্পূর্ণ ভারতীয় মতে সম্পন্ন হয় এবং সমবেত ছেলেমেয়েরা "সবপেয়েছির আসরের" জয় ঘোষণা করে'। যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত খবরটা এখানে পুরোটাই তুলে দিলাম। সমগ্র অনুষ্ঠানে মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি পানীয় জল সরবরাহের দায়িত্বে ছিল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, সাহিত্যিক, খেলোয়াড়গণ শ্রীযুক্ত পবিত্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সুনির্মল বসু, নির্মল কুমার ঘোষ (অমৃত বাজার পত্রিকা) যাদুকর পি সি সরকার (সিনিয়র), পি মিশ্র (হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড), শিল্পী বীরেন বল, ভৈরব দত্ত, নৃপেন্দ্র বসু ইত্যাদিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

যুগান্তর পত্রিকা এবং সবপেয়েছির আসর

অধুনালুপ্ত যুগান্তর পত্রিকার ছাতার তলায় সবপেয়েছির আসরের জন্ম হয়েছিল এবং প্রায় তিরিশের দশকের সময় থেকেই এর প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়েছিল। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুগান্তর পত্রিকার পথ চলা শুরু। এই খবর প্রকাশিত হয়েছিল এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত ইংরাজি দৈনিক 'দ্য লিডার' পত্রিকাতে : A Bengali nationalist daily of the name of 'Jugantar' (New Era) is the latest addition to the list of Calcutta dailies. Enumerating the policy for which it stands the paper says, 'We shall always keep in view the Congress objective of ushering in a new era by establishing their birthright of political freedom, social emancipation and industrial regeneration and with that end in view we shall persistently direct our energies regardless of the consequences (২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)।

যুগান্তর পত্রিকায় প্রত্যেক রবিবার (পরের দিকে মঙ্গলবার) শেষের পাতায় প্রকাশিত ছোটদের পাততাড়ি বা সবপেয়েছির আসরের খবর আসরের প্রচারের ক্ষেত্রে এক বড় ভূমিকা পালন করেছিল। পত্রিকায় প্রতি রবিবার শেষের পাতাতে প্রকাশিত হত 'ছোটোদের পাততাড়ি' যেখানে 'স্বপনবুড়োর চিঠি' ছিল এক বিশেষ আকর্ষণ। এই কলামে সাধারণতঃ আসর গঠনের উদ্দেশ্য, অনুষ্ঠান ও ভবিষ্যতের দিশা নির্দেশের উল্লেখ থাকত। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে শেষের পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল 'ছোটোদের পাততাড়ি নববর্ষ সংখ্যা' এবং সেখানে স্বপনবুড়ো আসরের কিশোর-কিশোরীদের উদ্দেশ্যে লেখেন 'যে দুঃখ-দৈন্য হতাশা আর নিরাশায় ভরা বিগত বৎসরকে আমরা পেছনে ফেলে এলাম, তার জন্যে শোক আমরা করবো না, কেন না কর্ম্মী আমরা কাজ করে যাবো........ সেই কাজ শতদল হয়ে বিকশিত হয়ে উঠুক এইত আমাদের স্বপ্ন। বেশী উপদেশে তোমাদের জীবন আমি ভারাক্রান্ত করে তুলব না—কেননা, গুরুমশায়ের দলের লোক আমি নই। আমি তোমাদের সঙ্গে নেমে আসতে চাই পথের ধুলোয়.........হাতে হাত দিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কর্মের রথ-চক্র আমরা চালিয়ে নিয়ে যাবো সম্মুখের সুনির্দিষ্ট পথে। যদি উচ্চতার শিখরে বসে ভিক্ষামুষ্টির মতো তোমাদের উপদেশই বিতরণ করি, তবে কোনো কালেই তোমাদের 'খেলাঘরের' পথের সম্মান পাব না। তাই রবীন্দ্রনাথের ধনঞ্জয় বৈরাগীর মতো কর্ম্মের পথকেই আমাদের একান্ত করে বেছে নিতে হবে—নববর্ষের সোনালী রোদ-মাখা এই পুণ্য প্রভাতে' (যুগান্তর পত্রিকা, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৮)। বাংলার শিশু, কিশোর-কিশোরীদের প্রতি স্বপনবুড়ো বা শ্রী অখিল বন্ধু নিয়োগীর এই অগাধ অকৃত্রিম ভালোবাসাই সবপেয়েছির আসরকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে বছরের পর বছর। 'মানুষ গড়ার কারখানা তৈরির সঙ্কল্প আর রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের 'সবপেয়েছির দেশ' দুইয়ের মিলনেই গড়ে ওঠে 'সবপেয়েছির আসর'। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির প্রাক্কালে এর যাত্রা শুরু। শোভাবাজার রাজবাড়ী, বাগবাজার নিবেদিতা লেন, আহিরীটোলা বিকে পাল অ্যাভিনিউ, হেদুয়া—একের পর এক পল্লীতে তৈরি হতে থাকে শাখা আসর। অচিরেই তা ছড়িয়ে পড়ল শহরতলী, জেলাঞ্চল ছাড়িয়ে ভিনরাজ্যেও' (আনন্দ বাজার পত্রিকা, কলকাতার কড়চা, ২২শে জুলাই ২০১৯, সোমবার)। তাই আট দশক পরেও সবপেয়েছির আসরের প্রভাব এবং নববর্ষ উৎসবের আকর্ষণ এখনও কমেনি। শুধু সময়টা বদলে গেছে।

* নবারুণ শিশু মিলন সবপেয়েছির আসর, পানিহাটি কোলকাতা-৭০০ ১১৪

সবপেয়েছির আসর
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শিক্ষণ দীপিকা

সবপেয়েছির আসরের শিক্ষণ সিলেবাস পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হলো। সকল অঞ্চল ও শাখা আসরদের এ বিষয়ে নজর দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রতি পর্যায়ের শিক্ষা শ্রেণির প্রশস্তিকা ও ব্যাজের জন্য শিক্ষার্থী প্রতি ২০ টাকা।

শিক্ষা শ্রেণীর পরিচালনায় খরচ বহন করবার জন্য মূলকেন্দ্র আঞ্চলিক সংগঠকদের মাথাপিছু পাঁচ টাকা অনুদান দেবেন। আসর প্রবেশিকা পর্যায়ে সোনারকাঠিদের ন্যূনতম পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী হওয়া আবশ্যিক। কর্মী ভাই বোনেরা অংশ নিতে পারবে।

আসর প্রবেশিকা ও আসর মধ্যম পরীক্ষার মোট মান - ১০০, প্রত্যক্ষ শারীর শিক্ষা - ৭০, প্রাথমিক চিকিৎসা - ১০, কর্মশিক্ষা - ১০, সাংস্কৃতিক, ব্যবহারিক ও সাংগঠনিক - ১০, আসর অগ্রণী ও আসর অগ্রদূত মোট মান - ২০০, শারীর শিক্ষা - ১০০, খো-খো - কাবাডি - এ্যাথলেটিক্স - ৩০, কর্মশিক্ষা - ২০, প্রাথমিক চিকিৎসা - ১৫, সাংগঠনিক - ১০, সাংস্কৃতিক - ব্যবহারিক - সাধারণ জ্ঞান - ২৫

উত্তীর্ণ হতে হলে ৩০ শতাংশ পাওয়া চাই

৩০ থেকে ৪৪ শতাংশ - তৃতীয় শ্রেণী

৪৫ থেকে ৫৯ শতাংশ - দ্বিতীয় শ্রেণী

৬০ বা তার অধিক - প্রথম শ্রেণী

আসর প্রবেশিকা

শিক্ষাসূচী :

১) কুচকাওয়াজ : সাবধান, বিশ্রাম, লাইন-ফাইল তৈরী করা, আরাম সে, ডাহিনা সাজ, সামনা দেখ, ডাহিনা-বাঁয়া-পিছে মুড়, কদম তাল, থাম। ২) ক্যালেস্থেনিকস : সমবেত ব্যায়াম, তালি ব্যায়াম (যে কোন একটি)। ৩) দ্রব্যাদি ড্রিল : (ক) পতাকা ড্রিল (নতুন), (খ) দণ্ড ড্রিল, ৪) ভঙ্গীগীতি : (ক) সপেআ গড়েছি আমরা, (খ) হাম সব ভারতীয় হ্যায় (যে কোন একটি) ৫) ছড়ার ব্যায়াম : (ক) এক যে ছিল মস্ত হাতী, (খ) শিলের উপর নোড়া রেখে, (গ) বড়কির বোন ছুটকি (যে কোন একটি)। ৬) লঘু নিয়মের খেলা : (ক) সুপ্রভাত, (খ) জিগজ্যাগ রিলে, **Do this, do that** (যে কোন একটি) ৭) ব্রতচারী : প্রার্থনা, তিন উক্তি, পঞ্চব্রত, প্রতিজ্ঞা, ১২ পণ, বাংলা ভূমির দান, ব্রতচারী হয়ে দেখ (গান)। ৮) সংগীত : আসর গীতি (একই মত), পতাকা গীতি। ৯) লোকনৃত্য : (ক) যে কোন একটি প্রাদেশিক লোকনৃত্য, (খ) **Shoe Fly Dance** ১০) যোগাসন : পদ্মাসন, উষ্ট্রাসন, গোমুখাসন, (যে কোন একটি)। প্রাণায়াম : অনুলোম বিলোম, ভস্ত্রিকা, ১১) প্রাথমিক চিকিৎসা : প্রাথমিক চিকিৎসা কি, ক্ষত, জনস্বাস্থ্য। ১২) কর্মশিক্ষা : আলপনা, কাগজের ফুল, ১৩) সাংস্কৃতিক : আবৃত্তির বিষয় নির্বাচন। ১৪) সাংগঠনিক, ব্যবহারিক ও সাধারণ জ্ঞান : আসরের কাজ শুরু ও শেষ করার পদ্ধতি, নিজের জেলাকে জানো। ১৫) বিশেষ বিষয় : (ক) কবাডি খেলার মাঠ, মধ্যরেখা, কোল চড়াই সময় ও খেলোয়াড়, (খ) খো-খো সাবজুনিয়র কোর্টের মাপ, খুঁটির উচ্চতা (যে কোন একটি)।

আসর মধ্যম

শিক্ষাসূচী :

১) কুচকাওয়াজ : প্রাথমিক পর্যায়ের পুনরনুশীলন, এর সাথে তেজচল মার্চিং অবস্থায় ডাহিনা, বাঁয়া, পিছে মুড়। ২) খালি হাতে ব্যায়াম : প্রাথমিক পর্যায়ের পুনরনুশীলন, এবং (ক) নিবিড় ব্যায়াম (খ) ধীর ব্যায়াম (গান সহ)। ৩) দ্রব্যাদি ড্রিল : (ক) ব্রতচারী বাংলার মানুষ আমরা সাথে ডাম্বল ড্রিল, (খ) লেজিম ড্রিল (বরোদা)। ৪) ভঙ্গীগীতি : (ক) একই সূত্রে বাঁধিয়েছি সহস্রটি মন, (খ) নও জওয়ানো ভারত কি, (যে কোন একটি) ৫) ব্রতচারী : প্রাথমিক পর্যায়ের পুনরনুশীলন এবং কোদাল চালাই, বাংলা ভূমির মাটি, সারি, চির ধন্য সুজলা ভূমি বাংলার। ৬) খেলা : (ক) ব্যালেন্স রিলে (খ) ইঁদুর বিড়াল (গ) ঘর বদল। ৭) ছড়ার ব্যায়াম : (ক) কি মজা কি মজা, (খ) হলুদ হলুদ গাঁদা ফুল (গ) ডালে বসে কাক ডাকে। ৮) সংগীত : (ক) আসর সংগীত (আমাদের আসরের সব শুভ হোক), (খ) বিশ্বের সব শিশুদের, (গ) ভারত আমার ভারতবর্ষ। ৯) লোকনৃত্য : (ক) হিমাচল প্রদেশ (গহিলে না), (খ) বধূবরণ (সোহাগ চাঁদ বদনী), (গ) ডে-ডেভিড (ইসরায়েল)। ১০) যোগাসন : (ক) ভূজঙ্গাসন, (খ) ধনুরাসন, (গ) অর্ধকুর্মাসন। প্রাণায়াম : ভ্রামরী, কপালভাতি। ১১) সাংস্কৃতিক : অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পর্ব। ১২) প্রাথমিক চিকিৎসা : (ক) অস্থিভঙ্গ (খ) ব্যান্ডেজ, (গ) জনস্বাস্থ্য। ১৩) কর্মশিক্ষা : (ক) রাখি তৈরী (খ) ফুল তৈরী। ১৪) সাংগঠনিক, ব্যবহারিক ও সাধারণ জ্ঞান : আসরের পোশাক, আসর পতাকা। ১৫) বিশেষ বিষয় : (ক) খো-খো, আসর প্রবেশিকার বিষয়গুলি সহ দল, সময়, খেলার পরিচালকমণ্ডলীর কাজ, (খ) কাবাডি, আসর প্রবেশিকার বিষয়গুলি সহ লবি, খেলার পরিচালক, পোশাক।

আসর অগ্রণী

শিক্ষাসূচী :

১) কুচকাওয়াজ : আসর প্রবেশিকা, আসর মধ্যম পর্যায়ের পুনরনুশীলন, লাইন তোড়, বিসর্জন, মার্চ পাস্ট, স্যালুট। ২) খালি হাতে ব্যায়াম : পূর্ব শিক্ষাসূচীর পুনরনুশীলন, স্টেপ ড্রিল। ৩) দ্রব্যাদি ড্রিল : (ক) ছাতা ড্রিল, (খ) স্টার ড্রিল। ৪) ভঙ্গীগীতি : (ক) মুক্তির মন্দির সোপান তলে, (খ) দেশ হামারা ধরতী আপনি। ৫) ছড়ার ব্যায়াম : (ক) বিড়ালটা সাধু সেজেছে, (খ) ওপাড়াতে ছিল এক ভুঁড়ি ওয়ালা সর্দার, (গ) এক দুই তিন এলো খুশির দিন। ৬) খেলা : পূর্ব শিক্ষাসূচীর সাথে (ক) বাউন্স বল রিলে, (খ) হুপিং রিলে। ৭) ব্রতচারী : পূর্ব শিক্ষাসূচীর পুনরনুশীলন, বীরনৃত্য, আমরা বাঙালী, সবার প্রিয়, স্বাগত। ৮) লোকনৃত্য : (ক) গুজরাটি ডান্ডিয়া, (খ) পাইক, (গ) গুস্তাফের স্কোল। ৯) গান : (ক) সান্ধ্য মজলিস সংগীত, (খ) যে কোন একটি লোকগীতি। ১০) এ্যাথলেটিক্স : ১০০ মিটার দৌড়ের কৌশল। ১১) কর্মশিক্ষা : (ক) মঞ্চ সজ্জা, (খ) বই বাঁধানো। ১২) যোগাসন : (ক) বদ্ধ পদ্মাসন, (খ) হলাসন, (গ) মৎস্যাসন। প্রাণায়াম : পূর্ব শিক্ষাসূচীর সকল প্রাণায়াম, উজ্জায়ী, বাহ্য। ১৩) সাংস্কৃতিক : দেওয়াল পত্রিকা অলংকরণ, অভিনয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা। ১৪) জিমন্যাস্টিক : (ক) ফরওয়ার্ড রোল, (খ) **T** ব্যালেন্স। ১৫) প্রাথমিক চিকিৎসা : (ক) আগুন লাগা, (খ) জলে ডোবা, (গ) জনস্বাস্থ্য বিষয়ক। ১৬) সাংগঠনিক সাধারণ জ্ঞান : আসর গড়ার নিয়মাবলী, নিজের রাজ্যকে জানো। ১৭) ব্যবহারিক : পথ চলার নিয়ম। ১৮) বিশেষ শিক্ষা : খো-খো – প্রবেশিকা, মধ্যম বিষয়াবলী সহ বিভিন্ন বাঁশীর সংকেত, খেলোয়াড়দের পরিচিতি, (খ) কাবাডি – পূর্ব শিক্ষাসূচী সহ লোনা, দম, আক্রমণকারী, প্রতিপক্ষ।

আসর অগ্রদূত

শিক্ষাসূচী :

১) কুচকাওয়াজ : পূর্ব শিক্ষাপর্যায়ের পুনরনুশীলন, আনুষ্ঠানিক অভিবাদন। ২) খালি হাতে ব্যায়াম : পূর্ব শিক্ষাসূচীর পুনরনুশীলন, মুডিং পিটি। ৩) দ্রব্যাদি ও ছন্দাত্মক ড্রিল : (ক) জিপসী, (খ) আইরিশ ড্রিল। ৪) ভঙ্গীগীতি : (ক) চলরে চল সবে, (খ) হাম জওয়ানো হিন্দ। ৫) খেলা : (ক) ডজ বল, (খ) ডাবল সার্কেল পাস রিলে, (গ) স্কিপিং রিলে। ৬) ব্রতচারী : পূর্ব শিক্ষাসূচীর পুনরনুশীলন, বাউল, আমরা মানুষ দল, ঝুমুর, তরুণ দল, রায়বেঁশে, আগুয়ান বাংলা (গান)। ৭) ছড়ার ব্যায়াম : (ক) পূর্ব শিক্ষাসূচী ব্যতীত যে কোন দু'টি ছড়া। ৮) সংগীত : (ক) সারে জাঁহাসে অচ্ছা, (খ) **We shall overcome** ৯) লোকনৃত্য : (ক) পাঞ্জাবী কিষাণ, (খ) ভারজিনিয়া রিলস্। ১০) বাদ্য : ব্যান্ড ও বাঁশি, ১১) কর্মশিক্ষা : পুতুল নির্মাণ। ১২) যোগাসন : (ক) পদ হস্তাসন, (খ) অর্ধ-চন্দ্রাসন, (গ) সর্বাঙ্গাসন। ১৩) জিমন্যাস্টিক : (ক) ব্যাকওয়ার্ড রোল, (খ) আর্চ। ১৪) এ্যাথলেটিক্স : ২০০ মিটার দৌড়ের কৌশলাদি। ১৫) প্রাথমিক চিকিৎসা : সর্পাঘাত ও চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য। ১৬) সাংস্কৃতিক : শিশু নাটক রচনা পরিবেশন। ১৭) সাংগঠনিক ও সাধারণ জ্ঞান : আসর গঠন বিধান, আসর পরিচালনা ও কর্মী সংক্রান্ত বিধান, নিজের দেশকে জানো। ১৮) ব্যবহারিক : (ক) নটিং, (খ) পতাকা সংকেত (বাংলা)। ১৯) বিশেষ শিক্ষা : খো-খো ও কবাডি খেলার পর্ব শিক্ষাসূচী সহ বিভিন্ন নিয়ম সম্পর্কে সব্যক ধারণা।

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 53

বারো মাসে তেরো পার্বণ

তেরো পার্বণের প্রথম পার্বণ যে বিষয়টি নিয়ে লেখা শুরু করি "বর্ষবরণ" ১ বৈশাখ ১৪২৮ অতিমারীর কারণে করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে সরাসরি না করতে পারলেও অন্তর্জালের মাধ্যমে করার চেষ্টা করেছি।

❑ ২রা মে ২০২১ বিশিষ্ট চলচিত্রকার, সাহিত্যিক অস্কার এবং ভারতরত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত - ৺সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিবস পালন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০তম জন্ম বার্ষিকী

❑ গত ২৫শে বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ ৯ই মে ২০২১ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০তম জন্মবার্ষিকী পালিত হ'ল অন্তর্জালের মাধ্যমে। পরিচালনায় সবপেয়েছির আসর মূলকেন্দ্র। ১৬টি অঞ্চলের ৩৯টি আসরের সোনারকাঠি ভাই-বোন এবং কর্মী ভাই-বোন নৃত্য, গীতি ও আবৃত্তির মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সংগঠনের সহ: মূল সত্যসেবী জয়দেব বারুই। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন উ: নদীয়া অঞ্চলের রাণাঘাট আসরের কৃত্তিকা পাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মূল সত্যসেবী দিলীপ চক্রবর্ত্তী, শুভেচ্ছা বাণী প্রদান করেন সংগঠন সচিব তিমির বরণ সরস্বতী, বিশ্বকবি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন আভ্যন্তরীন হিসাব পরীক্ষক রবীন্দ্রনাথ রায়। অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ছিলেন সাংস্কৃতিক সচিব স্বপন রায় এবং উপস্থাপনা ও প্রচারে ছিলেন প্রচার সচিব গোপাল ভৌমিক।

❑ ১০ই মে ২০২১ - **স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত'র জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলী**। কেন্দ্রীয় শিশুভবনে গুরুজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে সহ মূলসত্যসেবী জয়দেব বারুই এবং ক্রীড়া সচিব বলরাম হালদার। অন্তর্জালের মাধ্যমে ৫টি অঞ্চলের ৭টি আসর অংশ নেয়। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সংগঠনের সভাপতি কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, শুভেচ্ছাবাণী শিক্ষণ সচিব বিকাশ প্রামাণিকও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সাংস্কৃতিক সচিব স্বপন রায় এবং সংযোজনা ও উপস্থাপনায় প্রচার সচিব গোপাল ভৌমিক।

❑ সবপেয়েছির মূলকেন্দ্রের পরিচালনা অন্তর্জালের মাধ্যমে গত ২৬শে মে ২০২১ **বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্ম দিবস** পালিত হ'ল। অংশগ্রহণে সোনারকাঠি ও কর্মী ভাই-বোনেরা। সহযোগিতায় বিভিন্ন অঞ্চলের আসর। নৃত্যগীত ও আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি খুব সুন্দর হয়। বিদ্রোহী কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন মূলসত্যসেবী দিলীপ চক্রবর্ত্তী। স্বাগত ভাষণ এবং কবির সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন আভ্যন্তরীণ হিসাব পরীক্ষক রবীন্দ্রনাথ রায়। শুভেচ্ছাবাণী দেন সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি অপূর্ব গাঙ্গুলী। পরিশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সেবা সচিব হরেকৃষ্ণ দে।

❑ **৭৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস ২৯শে জুলাই, ২০২১**

সকল ১১টায় উত্তর কোলকাতার জগৎ মুখার্জী পার্ক, রাজবল্লভ পাড়া স্বপনবুড়ো শিশু প্রাঙ্গণে সবপেয়েছির আসর প্রতিষ্ঠাতা স্বপন বুড়োর প্রস্তর ফলকে মাল্যদান করেন প্রাক্তন মূলসত্যসেবী সব্যসাচী চৌধুরী, উত্তর কোলকাতা সংগঠক পুলক রঞ্জন দে, গোপীমোহন আসরের পক্ষ থেকে শম্ভু রায়, সুকান্ত দে, প্রত্যুষ মুখার্জী ও রাণাপ্রতাপ আসরের পক্ষ থেকে সুবীর কর। বিকাল ৪ ঘটিকায় কেন্দ্রীয় শিশুভবনে আসর পতাকা উত্তোলন করেন সবপেয়েছির আসরের সভাপতি শ্রীকমলেশ চ্যাটার্জী, পতাকাগীতি, সঙ্কল্প বাক্য পাঠের পর প্রতিষ্ঠাতা স্বপনবুড়োর আবক্ষ মুর্তিতে মাল্যদান করেন সভাপতি কমলেশ চট্টোপাধ্যায় সহ কার্যকরী সভাপতি অপূর্ব গাঙ্গুলী, মূলসত্যসেবী দিলীপ চক্রবর্ত্তী, শিশুভবন সচিব নিখিল রায় ও আরও অনেকে। বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানের পর পথ শিশুদের খাতা কলম ও মাস্ক বিতরণ করা হয়। ৭৭টি প্রদীপ প্রজ্বলনের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে ভোরের তারা আসর। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও আশীর্বাণী দেন যথাক্রমে সভাপতি ও কার্যকরী সভাপতিদ্বয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ভোরের তারা ও সতীন সেন স্মৃতি আসর। এইদিন আসরবাণীর নববর্ষ প্রতিষ্ঠা দিবস সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রকাশনা সচিব তারক মজুমদারের তত্ত্বাবধানে। সঞ্চালনা করেন প্রচার সচিব গোপাল ভৌমিক এবং সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিচালনায় ছিলেন সাংস্কৃতিক সচিব স্বপন রায়।

এছাড়া অন্তর্জালের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা দিবস সম্প্রচার করা হয়। উপস্থিত ছিলেন; কার্যকরী সভাপতি অপূর্ব গাঙ্গুলী, সহ: সভাপতি প্রদীপ রায়, বিষ্ণুজীবন চক্রবর্ত্তী, মূলসত্যসেবী, সহ: মূলসত্যসেবী, শিশুভবন সচিব, সাংস্কৃতিক সচিব ও প্রচার সচিব। ১৭টি অঞ্চলের ৩৯টি শাখা আসর অংশ নেয়। সঙ্গীতে হরপ্রসাদ মুখার্জী, কেন্দ্রীয় কর্মী ও আজীবন সদস্য নারায়ণ শঙ্কর দাসের লেখা ও নিজস্ব সুরে একটি গান "খুলবে জানি সেই খুলবে" পরিবেশ করেন।

এছাড়াও প্রতিটি অঞ্চলে বিভিন্ন শাখা আসর প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে।

জাতীয় ক্রীড়া দিবস - ২৯শে আগষ্ট

কেন্দ্রীয় কর্মসূচী সামাজিক অন্তর্জাল মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের বক্তব্য আসরের সোনারকাঠি ভাই-বোনেদের শরীর-মন-নিজস্ব পারদর্শিতার অনুশীলন করার আহ্বান ছিল। বিশেষ করে অলিম্পিয়ান (শুটিং) মাননীয় জয়দীপ কর্মকার, প্রাক্তন সোনারকাঠি অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত কবাডি খেলোয়াড় রমা সরকার, প্রাক্তন ফুটবল হকি হ্যান্ডবল খেলোয়ার অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত শান্তি মল্লিক, প:ব: সরকারের বাংলা গৌরব পুরস্কারপ্রাপ্ত দেবাশীষ সেন প্রাক্তন সোনারকাঠি ও জাতীয় খো-খো খেলোয়াড় কল্যাণ চ্যাটার্জী, ক্রীড়া সংগঠক শ্রী অজিত ব্যানার্জী (আই. এফ. এ. সভাপতি ও আই.ও.এ.-এর কাউন্সিল সদস্য), বি.ও.এ.-এর প্রাক্তন সচিব ও খো-খো ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার সহ: সভাপতি শ্রী কমলেশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শুভেচ্ছা জানান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মূল সত্যসেবী দিলীপ চক্রবর্ত্তী। সহ: মূল

সত্যসেবী জয়দেব বাড়ুই এবং সবপেয়েছির আসরের ক্রীড়া উপসমিতির চেয়ারম্যান তন্ময় চক্রবর্ত্তী ধন্যবাদ দেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ক্রীড়া সচিব বলরাম হালদার, টেকনিক্যাল সহযোগিতা করেন তীর্থিক দত্তগুপ্ত। কেন্দ্রীয় শিশুভবনে বৈকালিক কমসূচীতে জাতীয় পতাকা ও আসর পতাকা উত্তোলন করা এবং ধ্যাঁনচাঁদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। বিভাগীয় সচিব সহ সহ:মূলসত্যসেবী দক্ষিণ কোলকাতার অঞ্চল প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মদিন

২৬শে সেপ্টেম্বর ২০২১ কেন্দ্রীয় শিশুভবনে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০২তম জন্মদিবস পালন করা হ'ল। সকাল ১০টায় প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন শিশুভবন সচিব শ্রী নিখিল রায় মহাশয়। সাংস্কৃতিক সচিব, ক্রীড়া সচিব, সহ:মূলসত্যসেবী দক্ষিণ কোলকাতা অঞ্চল সংগঠক এবং সহ: সংগঠক মাল্যদান করেন।

প্রধান অতিথি ডঃ সংগীতা ঘোষ মজুমদার মাল্যদান করেন এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন সমাজসেবা ও শিক্ষামূলক দিক আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেন।

বর্ষবরণে সোনারকাঠির ছোঁয়া

বিশ্বব্যাপী মারণরোগ করোণার কারণে বিগত দু'টি বছর সবপেয়েছির আসরের দৈনন্দিন কর্মসূচী প্রায় বন্ধ ছিল। একটি কারণে এই বছরগুলিতে কেন্দ্রীয় নববর্ষ উৎসবের আয়োজন সম্ভব হয়নি। ১৪২৯ বঙ্গাব্দকে আমরা বরণ করেছি আমাদের সংগঠনের চিরাচরিত ধারায় বিভিন্ন জেলা-অঞ্চলে। এবছর সবপেয়েছির আসরের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল সংগঠনের দক্ষিণ কলকাতা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় বেহালার-সুরশুনা কলেজ মাঠে। কেন্দ্রীয় কর্মী বাহিনী এবং অঞ্চলের বিভিন্ন আসরকর্মী সোনারকাঠিদের সমবেত সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা। সংগঠনের নিজস্ব প্রথায় রাখী ও চন্দনে অতিথিদের বরণ করাহয়। আসর পতাকা উত্তোলন করলেন স.পে.আ.র কার্যনির্বাহী সভাপতি এবং অনুষ্ঠান সভাপতি অপূর্ব গাঙ্গুলী। স্বাগত জানান সংগঠনের মূল সত্যসেবী (সাধারণ সম্পাদক) দিলীপ চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি কলকাতা পুরসভার ১২৭ নং ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি শ্রীমতী মালবিকা বৈদ্য সবপেয়েছির আসরের কর্মসূচীর প্রশংসা করে নববর্ষে আগত শিশু-কিশোর ভাইবোনেদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে আগামীর সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য উৎসাহিত করেন। সবপেয়েছির আসরের ভাই-বোনেরা সমবেত ব্যায়াম, ধীর ব্যায়াম, তালি ব্যায়াম, কর্মসংগীত ও ছড়া প্রদর্শন করে। প্রায় ছয়শ' সোনারকাঠি ভাই-বোন ও স্থানীয় দু'টি বিদ্যালয়ের শিশুরা এই সমবেত ক্রীড়া অভিপ্রদর্শনীতে অংশ নেয়। অতিথি মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন একাদেমী অব ফাইন আর্টস-এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল মহাশয়, বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীকুমার রায় চৌধুরী, পথ ও পথিক সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিদ্যুৎ চৌধুরী, সংগঠনের কার্যনির্বাহী সমিতির বর্ষীয়ান সদস্য নিখিল রায়, শিক্ষণ সচিব তরুন চক্রবর্তী, উপদেষ্টা মন্ডলীর সমস্যা রিক্তা ঘোষ, সহ: মূল সত্যসেবী জয়দেব বারুই, কার্যকরী সমিতির সদস্য তরুন চৌধুরী, গণিপুর শীতলা হাইস্কুলের শিক্ষারত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ড. সুজিত কর প্রমুখ। সোনারকাঠি - কর্মী ভাই-বোনেরা সমবেত ব্রতচারী প্রদর্শন করে। সাংস্কৃতিক সচিব স্বপন রায়ের পরিচালনায় কর্মীদলের রাইবিশে ও রাইবেশে নৃত্য ছিল অত্যন্ত আকর্ষনীয়। এবছর 'স্বাধীন ভারতবর্ষের ৭৫তম বর্ষ' - অনুষ্ঠানে বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে অনুষ্ঠানের ব্যানার হোর্ডিং-এ উল্লেখিত হয় এবং অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শাখা আসর পৃথকভাবে বিভিন্ন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তার নিদর্শন পরিবেশন করে। শিশুভবন, গার্ডেনরীচ, সন্ধ্যাতারা, সন্তোষপুর সুকান্তমেলা, বেহালা বোধয়ন ও শিশুভারতী আসরের ভাই বোনেরা এই সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেয়। বেহালা বোধয়ন আসরের মানসিক প্রতিস্পর্ধী ভাইবোনেদের অনুষ্ঠান বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। আসরের সমবেত ব্রতচারী পরিচালনায় সবপেয়েছির আসরের কেন্দ্রীয় নববর্ষ উৎসবে এই প্রথম সংগঠনের প্রাণপুরুষ-শিক্ষাগুরু সনৎ ভট্টাচার্যের অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিতি বারংবার ঘোষিত ও আলোচিত হয়। আসর পতাকা অবনমন, আসর সংগীতের মাধ্যমে প্রথানুযায়ী আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির পরে মিষ্টিমুখের আয়োজনে ও সংগঠনের নববর্ষ উৎসবের চিরাচরিত ছাপ পাওয়া গেছে। সামগ্রিক অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত আকর্ষনীয়। সোনারকাঠি কর্মীদের প্রাণের ছোঁয়ায় বহুদিন পর সবপেয়েছির আসরের এই অনুষ্ঠান প্রকৃত অর্থেই মিলনমেলার রূপ ধারণ করে।

আসরের গান

কথা : শ্রী পরিমল দাস
(সংগঠক দুর্গাপুর অঞ্চল স.পে.আ
সুর : শ্রী সন্তোষ কুমার দে

সবপেয়েছির আসর
আমাদেরই মেলা
সবাই মিলে একসাথে
আমরা করি খেলা

নেই কোন ভেদাভেদ
আমাদের মাঝে
হিংসা দ্বেষ নেই
মনের মাঝে
সবার মনে ভাসিয়ে দেব
আনন্দের ভেলা।
সবপেয়েছির আসর
আমাদেরই মেলা
সবাই মিলে একসাথে
আমরা করি খেলা।

সবার কাছে শিক্ষা নিয়ে
আমরা বড় হবো
গড়বো সবল শরীর মন
সত্য পথে চলবো
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালবো মোরা
শপথ নেওয়ার পালা।
সবপেয়েছির আসর
আমাদেরই মেলা
সবাই মিলে একসাথে
আমরা করি খেলা।

II	পা	মা	গা	রা	।	সা	-	-	-	।
	সব	পেয়ে	ছির	আ	।	স	০	০	র	।
	সা	রে	গা	মা	।	পা	পা	-	-	।
	আ	মা	দের	ই	।	মে	লা	০	০	।
	পা	মা	গা	রা	।	পা	মা	গা	রা	।
	স	বাই	মি	লে	।	এ	ক	সা	থে	।
	পা	মা	গা	রা	।	গরা	সা	-	-	।
	আম	রা	ক	রি	।	খে	লা	০	০	II
II	পা	ধা	পা	মা	।	গা	মা	পা	-	।
	নেই	কোনো	ভেদা	ভেদ	।	আমা	দের	মাঝে	০	।
	পা	ধা	পা	মা	।	গা	মা	পা	-	।
	হিং	সা	দ্বেষ	নেই	।	মনে	রমা	ঝে	০	।
	পা	ধা	পা	মা	।	পা	ধা	পা	মা	।
	স	বার	ম	নে	।	ভাসি	য়ে	দে	ব	।
	পা	পা	ধা	না	।	র্সা	র্সা	-	-	।
	আ	নন	দের	ই	।	ভে	লা	০	০	II
II	পা	ধা	পা	মা	।	গা	মা	পা	পা	।
	স	বার	কা	ছে	।	শি	ক্ষা	নি	য়ে	।
	পা	ধা	পা	মা	।	গা	পা	-	-	।
	আম	রা	ব	ড়	।	হ	বো	০	০	।
	পা	ধা	পা	মা	।	গা	মা	পা	-	।
	গড়	বো	স	বল	।	শ	রীর	ম	ন	।
	পা	ধা	পা	মা	।	গা	পা	-	-	।
	স	ত্য	প	থে	।	চল	বো	০	০	।
	পা	ধা	পা	মা	।	পা	ধা	পা	মা	।
	জ্ঞা	নের	প্র	দীপ	।	জ্বাল	বো	আম	রা	।
	পা	পা	ধা	না	।	র্সা	র্সা	-	-	।
	শ	পথ	নেও	য়ার	।	পা	লা	০	০	II

আমার প্রাণের আসর

কথা ও সুর : গণেশ মুখার্জী
(কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক স.পে.আ.)

এ আমার স্বপ্নের আসর
এ আমার গানের আসর
এ আমার প্রাণের আসর
সবপেয়েছির আসর।।

এখানে আছে হাসি আর গান
এখানে আছে শিশু কলতান
স.পে.আ'র ফুলবাগীচায়
এরাই তো জাতির আশা
হো হো....।।

জাতির ভেদ নাই ওরে নাই
একই ছত্রতলে
পেয়েছি যে ঠাঁই
দূর হবে যত দুরাশা
ভরে যাবে ভালোবাসা
হো হো ....।।

স্বরলিপি

তাল — কাহারবা

প প র্স -	র্স - র্রে র্স	নি র্স - -	- - - -
এ আ মা ঽর	স্ব প নে ঽর	আ সো ঽরে ঽ	ঽ ঽ ঽ ঽ
প প র্স -	র্স - র্রে র্স	নি র্স - -	- - - -
এ আ মা ঽর	গা ঽ নে ঽর	আ সো ঽর ঽ	ঽ ঽ ঽ ঽ
ম ম নি -	নি - র্স নি	ধ নি র্স নি	ধ প ম গ
এ আ মা ঽর	প্রা ঽ নে ঽর	আ সো ঽ ঽ	ঽ ঽ ঽ ঽর
প - - ম	গ - রে গ	রে স - -	স রে গ ম
স ঽ ঽব পে	য়ে ঽ ছি ঽর	আ সো ঽ ঽর	হো ঽ ঽ ঽ
প - - স	গ - রে গ	রে স - -	- - - -
স ঽ ঽব পে	য়ে ঽ ছি ঽর	আ সো ঽ ঽর	ঽ ঽ ঽ ঽ
র্স র্স র্স র্স	র্স - - -	র্স র্স র্রে র্স	র্স - - -
এ খা নে আ	ছে ঽ ঽ ঽ	হা সি আ ঽর	গা ঽন ঽ ঽ
ধ ধ প ধ	র্স - - -	র্স র্স নি র্স	র্রে - - -
এ খা নে আ	ছে ঽ ঽ ঽ	শি শু ক ল	তা ঽন ঽ ঽ
নি নি নি ধ	প - ধ প	ম - - -	- - - -
স পে আ ঽর	ফু ঽল বা গি	চা ঽ ঽ ঽয়	ঽ ঽ ঽ ঽ
ম ম নি নি	ধ - প ধ	ম প - -	- - - -
এ রা ঽই তো	জা ঽ তি ঽর	আ শা ঽ ঽ	ঽ ঽ ঽ ঽ
নি নি নি ধ	প - ধ প	ম - - -	- - - -
স পে আ ঽর	ফু ল বা গি	চা ঽ ঽ ঽয়	ঽ ঽ ঽ ঽ
ম ম নি নি	ধ - প ধ	ম প - -	নি - র্স -
এ রা ঽই তো	জা ঽ তি ঽর	আ শা ঽ ঽ	হো ঽ হো ঽ

[* "জাতির ভেদ নাই ওরে নাই" থেকে শেষ পর্যন্ত প্রথম অন্তরা অর্থাৎ "এখানে আছে হাসি আর গান'এর মতই স্বরলিপি হবে।]

Bikash Da\July 22\Sangathani Final July 22 # Final proof # 57

Space Donated by :

বড়জোড়া
পঞ্চায়েত
সমিতি

কাজল পোড়েল

সভাপতি

Advt Sangathani Dec 22 # 1 FINAL proof

Space Donated by :

বগুলা সবপেয়েছির আসর

স্থাপিত - ১৯৬০

বগুলা, নদিয়া

দেবাশিষ দাসগুপ্ত

।। সংঘমিত্র ।।

Advt Sangathani Dec 22 # 2 FINAL proof

সবপেয়েছির আসর

Space Donated by :

হাট আশুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

মনোজিৎ রায়
(প্রধান)

সমীর ক্ষেত্রপল
(উপঃ প্রধান)

Space Donated by :

বগুলা সবপেয়েছির আসর

বগুলা, নদিয়া

স্থাপিত - ১৯৬০

দেবজিৎ সাহা

সহ: সংঘমিত্র

সংগঠনী

"ব্রতচারী হ'য়ে দেখ

জীবনে কি মজা ভাই

হয়নি ব্রতচারী যে সে

আহা কি বেচারিটাই"।

শুভেচ্ছা সহ:

স্বপন কুমার রায়

বেহালা, কোলকাতা

Advt Sangathani Dec 22 # 4 FINAL proof

রাণাঘাট কোর্টপাড়া সংঘ সবপেয়েছির আসরের

"সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে"

প্রীতি ও শুভেচ্ছা

জানাই

কমল শিকদার

সংঘমিত্র

Advt Sangathani Dec 22 # 5 FINAL proof

প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উত্তর পর্বে শতবর্ষের
লক্ষ্যে সকলকে এগিয়ে যেতে হবে।

শুভেচ্ছায়

দিলীপ চক্রবর্ত্তী
সাধারণ সম্পাদক
সবপেয়েছির আসর

Advt Sangathani Dec 22 # 6 FINAL proof

সবপেয়েছির আসর

* মহাভারতের গল্পগুলো কি শুধুই কল্পনা নাকি পাব-বিজ্ঞান ও ইতিহাসের খোঁজ?
* গীতায় অর্জুনের অব্যক্ত কথাগুলি কি?
* মহাভারতের যুগে নারীদের অবস্থান কি ছিল?
* গো-ব্রাহ্মণের সাত কাহন জানতে চান কি?
* ব্রাহ্মণ কন্যারা কি সত্যিই ব্রাহ্মণ?

এবং

আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর জানতে পড়ুন ও পড়ান

মহাভারত অন্য চোখে

রবীন্দ্রনাথ রায়

Mobile : 82509 11883

সংগঠনী

Advt Sangathani Dec 22 # 7 FINAL proof

পরম পূজনীয় মাতা

রেখারাণী বসুর

আত্মার শান্তি কামনা করে

ও

সহধর্মিণী

মৈত্রেয়ী বসু

(চন্দনার)

স্মরণে

প্রণবরঞ্জন বসু

Advt Sangathani Dec 22 # 8 FINAL proof

আমি মৃদুলা দাস (সরকার) ছিলাম উত্তর নদিয়ার একজন একনিষ্ঠ কর্মী, সোনারকাঠি থেকে মূলকেন্দ্রের কর্মী। কর্মসূত্রে ও বিবাহসূত্রে এখন বর্তমানে ব্যারাকপুর অঞ্চলের বাসিন্দা। বর্তমানে আমার একটি পদ মর্যাদা বেড়েছে। আমি হয়েছি ব্যারাকপুর অঞ্চলের যুগ্ম সংগঠক। কোনদিনই চাইনি কোন পদ নিতে। কিন্তু সবপেয়েছির আসর মূলকেন্দ্রের পরিচালন সমিতি এই পদ আমাকে দিয়েছেন। আমি চাই এই পদের যেন যথাযথ সম্মান পাই। আমি নিজেও এই পদের মর্যাদা রাখার যথাযথ চেষ্টা করবো।

ধন্যবাদান্তে —

যুগ্ম সংগঠক,

ব্যারাকপুর অঞ্চল

Advt Sangathani Dec 22 # 9 FINAL proof

গুরু হরবোলা রবীন ভট্টাচার্য্যের

স্মরণে মননে অনুভবে

শ্রদ্ধার্ঘ্য

হরবোলা তালিম দিয়ে
'সবপেয়েছির আসর' চেনালে তুমি
তোমার আশিষে সোনারকাঠি
ভাই-বোনেদের আমি।

হরবোলা সুনীল আদকের
হরবোলার স্বরমন্ত্র
ও
পুতুল নাচের ইতিবৃত্ত
পুস্তক প্রকাশিত হইল।।

হরবোলা সুনীল আদক
বৈশাখী পার্ক, ঠাকুরপুকুর
কলকাতা - ৭০০ ০৬৩
মোঃ - ৯৮৩৬১৭৮৯৩৭

Advt Sangathani Dec 22 # 10 FINAL proof

সবপেয়েছির আসর

IN LOVING MEMORY

Of our Late M. D. ***National Award Winner*** *and founder of* ***Mechtech Designers & Engineers Pvt. Ltd.*** *Industrialist* ***MR. MADAN MOHAN LAHA****, Member of* ***SAB PAYECHIR ASAR****.*

D.O.B. - 11.11.1943 D.O.E. - 07.01.2021

সংগঠনী

সবপেয়েছির আসর

দক্ষিণ কোলকাতার অন্যতম প্রাচীন শিশু সংগঠন

চেতলা সবপেয়েছির আসর-এর

অন্যতম কর্ণধার, পরম অভিভাবক তথা

উপদেষ্টা পর্ষদের বর্ষীয়ান সদস্য

জয়ন্ত কুমার দত্ত-র

আকস্মিক প্রয়াণে

আমরা সকলে শোকাহত ও মর্মাহত

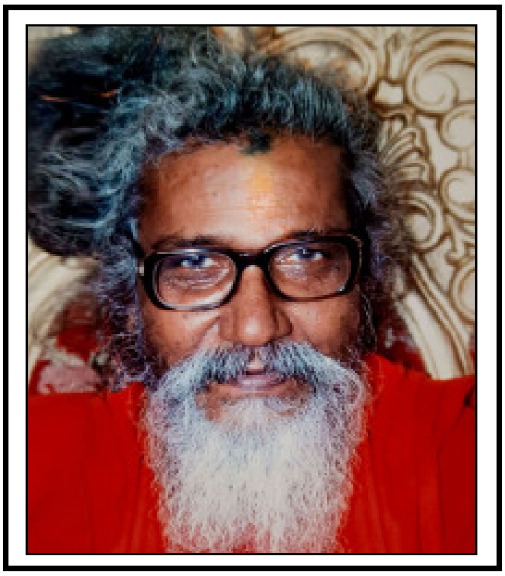

আত্মার চিরশান্তি কামনায় —

চেতলা সবপেয়েছির আসর পরিবারবর্গ

ও

দত্ত পরিবারবর্গ

চেতলা, আলিপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২৭

সংগঠনী

সবপেয়েছির আসর

"চাইলে সুস্থ শরীর, বিকশিত মন।
আসরের মাঠই পারে গড়তে জীবন।"

বর্তমান কোভিড মহামারী শিক্ষা দিয়েছে যত বেশী করে শিশুরা সংঘবদ্ধভাবে শরীরচর্চা ও সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে থাকবে তত বেশী সুস্থ শরীর ও মনের অধিকারী হবে। তাই সমস্ত শিশু কিশোরদের বিকালে আসরের মাঠে পাঠান।

বাঁকুড়া অঞ্চল সবপেয়েছির আসর

Space Donate By :

with thanks

BIBEK SARKAR

সাফল্য কামনায় :

আড়ংঘাটা
সবপেয়েছির আসর

আড়ংঘাটা, নদিয়া
পিন - ৭৪১৫০১

বুদ্ধদেব ঘোষ
সভাপতি

বিষ্ণুপদ রায়
সংঘমিত্র

সার্বিক আগ্রগতি কামনায় :

শিশু ও কিশোর কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান

গোপীমোহন সবপেয়েছির আসর

বর্তমানে আমাদের আসরে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য ব্রতচারী, লাঠিখেলা, যোগব্যায়াম, জিমনাস্টিক ও ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

১৫/১/১, রামকান্ত বোস স্ট্রীট,
সুভাষ বাগ শিশু উদ্যান
শ্যাম স্কোয়ার, (সাউথ ইষ্ট কর্ণার এ্যানেক্স),
কলকাতা - ৭০০ ০০৩

Space Doanted by :

DAS BROTHERS

More than 50 Years of Dedicated Service

Hardware & Paints Seller
and
Polishing Items Available

Specialist in :

All types of Hinges
(L-Hinges, W-Hinges),
Screws, Drawer Channels etc.

49, Chetla Road, Kolkata-700 027
Mobile : 9874019998

Space Doanted by :

সবপেয়েছির আসর মূলকেন্দ্র
অনুমোদিত বাঁকুড়া জেলার অনন্য
শিশু কল্যাণ প্রতিষ্ঠান

বড়জোড়া গ্রাম দীপাবলি
সবপেয়েছির আসর

স্থাপিত - ১৯৭৫

বড়জোড়া । বাঁকুড়া

With Best Compliments from :

শ্রীদীপক পাল

আমিন, সার্ভে ও ল'ক্লার্ক
আমিন রেজিষ্ট্রেশন নং **1627707008 W.B.**
ল'ক্লার্ক লাইসেন্স নং **EC005479**

এখানে যত্ন সহকারে, জমি রেজিষ্ট্রি, বিবাহ রেজিষ্ট্রি
ও জমির সার্ভে, ম্যাপ, জমির পরচা করা হয়।

মহাপ্রভু পাড়া, রাণাঘাট

ফোন : **9091420835, 9851756476**

Advt Sangathani Dec 22 # 14 FINAL proof

সবপেয়েছির আসর

Space Donate By :

।। বিশ্বের সব শিশুদের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়
চাই বড়ো হবার সব অধিকার,
কেউ যেন বঞ্চিত না হয়।।

নাসরা সবপেয়েছির আসর

স্থাপিত - ২০০৬

নাসরা, রানাঘাট, নদিয়া

বিজন সরকার — *সভাপতি*

রাজকুমার দাস — *সংঘমিত্র*

Space Donate By :

একটি শিশু একটি ফুল
যত্ন নিতে করোনা ভুল

রবীন্দ্রনগর মঞ্জরী সবপেয়েছির আসর

স্থাপিত - ১৯৭৬

রবীন্দ্রনগর, চাকদহ, নদিয়া

With Best Compliments from :

শিশুর ভালোয় অনির্বাণ
অনন্য মোর প্রতিষ্ঠান

সবপেয়েছির আসর-এর সার্বিক সফলতা কামনা করি—

বেতাই সবপেয়েছির আসর

বেতাই, নদিয়া

সুখেন চন্দ্র বিশ্বাস
সংঘমিত্র

মুঠোফোন : ৯১৫৩০৩৭৪৩৭

With Best Compliments from :

সবপেয়েছির আসরের সার্বিক শুভ কামনায় —

তেহট্ট ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠন

এর

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে

(১৯৭২-২০২২)

।। শিশু বিভাগ ।।

কিঞ্জল সবপেয়েছির আসর

তেহট্ট, নদিয়া

দূরভাষ : ৯৯৩২২৮০৭৫১, ৯১৫৩৮৫২০৯৫

সুমিত কুমার বিশ্বাস — *সভাপতি*

সুব্রত প্রামানিক — *সংঘমিত্র*

সংগঠনী

সবপেয়েছির আসর

Space Donate By :

নদিয়া জেলা তথা রাজ্যের সমস্ত
শিশুদের মঙ্গল কামনায়

শিশুমিলন
সবপেয়েছির আসর

*তুঁত বাগান (নাসরা) * রানাঘাট * নদিয়া*

শুভেচ্ছা সহ —

অশোক দেবনাথ	সনাতন সেন
সংঘমিত্র	*সংগঠন সচিব*
শিশুমিলন স.পে.আ.	শিশুমিলন স.পে.আ.
৮৬১৭৫৬৪২৭০	৭৯০৮৯২৩৩১৭

Space Donate By :

আসন্ন যুবকর্মী শিবিরের সাফল্য কামনায়
মদনপুর সবপেয়েছির আসর

শিশু কিশোর কল্যাণ প্রতিষ্ঠান
সবপেয়েছির আসর-এর
সার্বিক মঙ্গল কামনায়

হরেকৃষ্ণ দে
দক্ষিণ নদিয়া

Space Donate By :

আসন্ন যুবকর্মী শিবিরের সাফল্য কামনায়
মদনপুর সবপেয়েছির আসর

শিশু সংগঠনের অগ্রগতি
কামনা করি—

তাপস সেন
দক্ষিণ নদিয়া

Space Donate By :

আসন্ন যুবকর্মী শিবিরের সাফল্য কামনায়
মদনপুর সবপেয়েছির আসর

সবপেয়েছির আসর-এর
শ্রীবৃদ্ধি কামনায়

মালবিকা চক্রবর্ত্তী
দক্ষিণ নদিয়া

সবপেয়েছির আসর

Space Donate By :

শিশুদের অগ্রগতি ও
মঙ্গল কামনায়

শিমুরালি সবপেয়েছির আসর

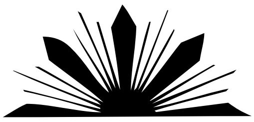

শুভেচ্ছা সহ

অমিতাভ ভট্টাচার্য্য

Space Donate By :

।। সবপেয়েছির আসরের
বর্ষব্যাপী
সকল কর্মসূচী সার্থক হোক ।।

মদনপুর সবপেয়েছির আসর

দক্ষিণ নদিয়া

A
Well
Wisher

Advt Sangathani Dec 22 # 17 FINAL proof

সবপেয়েছির আসর

৭৮তম

সবপেয়েছির আসর-এর

শুভকামনায়

করবী মুখার্জী

শুভেচ্ছা

জনৈক

সংগঠনী

৭৮তম বর্ষে
সবপেয়েছির আসর-এর
শুভ কামনায়

দীপক সেন চৌধুরী